# স্বাধীনতার সংগ্রাম

শ্রীমণিময় প্রামাণিক বি,এ

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস্
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

এক টাকা ]

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
২-এ, অক্রূর দত্ত লেন
'রহস্য-লহরী' প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১লা মে, ১৯২৮।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

## আমেরিকার স্বাধীনতা

আমেরিকা আবিষ্কার

সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের কোন জাতির এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অস্তিত্বও জানা ছিল না। পুরাকাল হইতে স্থলপথে আরব বণিকদের মারফতে ভারতের সহিত স্পেন-পর্ত্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত থাকায় স্পেন ও পর্ত্তুগীজবাসীদের মধ্যে সুবর্ণ-প্রসবিনী ভারতের অতুল ধনসম্পদ সম্বন্ধে অনেক আজগুবি গল্প রটিয়াছিল। এই সময় পর্ত্তুগাল ও স্পেনের কতিপয় অসম-সাহসী উদ্যমশীল যুবক জলপথে ভারত-আবিষ্কারের জন্য বাহির হ'ন। তরুণদের এই অভিযানে কলম্বস নামক জনৈক ব্যক্তি সহস্র বিপদ উপেক্ষা করিয়া ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ১২ই অক্টোবর ঊষার স্নিগ্ধ আলোকে এক সুবিস্তীর্ণ নূতন ভূখণ্ড দেখিতে পান,—এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই আমেরিকা এবং তদবধি ইহা নূতন-জগত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

## স্বাধীনতার সংগ্রাম

ইউরোপীয়দের নিকট আমেরিকা নূতন জগত হইলেও তাহা সকলের নিকট নূতন নহে। কতিপয় মনীষীর-গভীর-প্রাণপাত গবেষণার ফলে জানা যায় যে পুরাণাদিতেও আমেরিকায় হিন্দু-উপনিবেশের কথা উল্লিখিত আছে। যব, বলী, লম্বক ও বোর্ণিয়ো দ্বীপ দিয়া হিন্দুগণ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপগুলিতে আজও হিন্দুর বসতি বিদ্যমান থাকায় অতি প্রাচীন যুগের আমেরিকায় হিন্দু-উপনিবেশের কথা একেবারে ভিত্তিহীন বলিবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু দেখি না। যাহাই হউক এই পুস্তকে হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার বিষয়ক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে অনেকেই আমাদের অতীতের নৌ-অভিযানের গৌরব-কাহিনী সম্বন্ধে একেবারেই জানেন না। সেইজন্য এই আলোকের মাত্র আভাষ দিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই বিষয়ে আলোচনা করিলে অনেক লুপ্ত স্মৃতির-পঙ্কোদ্ধার হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের নৌ-অভিযান

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ ধনৈশ্বর্য্যের লোভে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের পর দেশ লুণ্ঠন করিয়া সমৃদ্ধিশালী হওয়াই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ইহার ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, কলহ লাগিয়াই ছিল। ঐশ্বর্য্য-লালসার তীব্র হলাহলে যখন ইউরোপ জর্জ্জরিত ঠিক সেই সময়ে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল।

উপনিবেশ স্থাপন

স্পেনীয়েরাই আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। এদিকে আমেরিকার সোণা দানার মণি-মাণিক্যের কথা সমগ্র ইউরোপে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এই সংবাদে ফরাসী, ইংলণ্ড ও হলাণ্ড প্রভৃতি দেশ লক্ষ্মীর কৃপালাভের আশায় দলে দলে আমেরিকায় ছুটিল। কিন্তু ইহারা কেহই

আমেরিকায় স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য নির্য্যাতিত, রাজনৈতিক অত্যাচারে প্রপীড়িত, অর্থ-কষ্টে ক্লিষ্ট ইউরোপীয়ানগণ প্রাণের দায়ে নিজেদের স্বদেশ, বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় আসিয়া স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই নির্য্যাতিত বিদেশাগত সর্ব্বহারা যাত্রীর দলই Pilgrim-fathers নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অবশ্য দক্ষিণে ভার্জ্জিনিয়া প্রভৃতি স্থলে তুলার চাষাবাদে প্রচুর ধনাগমের জন্য অনেক ইংরাজ ধনীসন্তানও আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে একটি ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হয়। মার্টিন লুথার এবং জর্জ্জ ফক্স্ এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের অগ্রদূত। তৎকালে সমগ্র ইউরোপে রোমের পোপের ক্যাথলিকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল। জার্ম্মাণীতে মার্টিন লুথার পোপের এই ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হ'ন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই অনেকেই লুথারের মতাবলম্বী হন। লুথার পোপের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে প্রতিবাদ মূলক অথবা Protestant Religion নামে অভিহিত। জর্জ্জ ফক্স নামক জনৈক পিউরিটান আবার কোয়েকার নামক এক সম্প্রদায় গঠন করেন। তিনি বিবেকের বাণীকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেন।

Pilgrim Fathers

ইংলণ্ডে বিভিন্ন খ্রীষ্ট-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ বাদ-বিসম্বাদ চলে; কিন্তু সে সময়ে ইংলণ্ডের রাজবংশ ছিল ক্যাথলিক। সুতরাং রাজার মতের বিরুদ্ধে চলিলে আর কাহারও রক্ষা ছিলনা। কাজেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ী পিউরিটানরা ভয়ানক ভাবে রাজশক্তি কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতে

লাগিল। দিনের পর দিন উৎপীড়নের মাত্রা চরমে পৌছিল। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য হেতু সহস্র সহস্র নরনারীকে গাছে ঝুলাইয়া ফাঁসী পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এবম্বিধ শত অত্যাচার সত্ত্বেও ধর্ম্মপ্রাণ পিটরিটানরা কিছুতেই নিজেদের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে রাজ-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া নিজ মাতৃভুমি চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর আমেরিকা মহাদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন, তথাপি নিজেদের বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দেন নাই। এই অত্যাচার উৎপীড়নে অটল স্বাধীন- চেতা ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীর দলই Pilgrim fathers নামে জগতের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ এবং আমেরিকার নবাগত এই যাত্রীরদল বর্ত্তমান আমেরিকাবাসীর পূর্ব্ব-পুরুষ।

আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা এই অভ্যাগতদের প্রথমতঃ সমাদরের সহিত আপন দেশে স্থান দিয়াছিল। কিন্তু অর্থগৃধ্ন নবাগতেরা উপকারীর উপকার বুঝিলনা। ইউরোপীয়ানগণ উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া ইণ্ডিয়ানগণের স্থান অধিকার করিতে সচেষ্ট হইল। তাহাদের প্রতি কুকুর শৃগালের ন্যায় বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিতে লাগিল। সুতরাং অসভ্য অধিবাসীরাও এই শঠতার যথাসাধ্য প্রত্যুত্তর দিতে ভুলিল না; কিন্তু হায়! সুসভ্য জাতির প্রতিযোগীতার সহিত পারিবে কেন? ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রকৃত অধিবাসীরা ধ্বংশের মুখে চলিল।

আদিম নিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ান

আমেরিকার এই আদিম-নিবাসীদের রেড-ইণ্ডিয়ান বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্পেনীয়েরা দলে দলে ভারত-আবিষ্কারের জন্যই বাহির হইয়াছিল। কাজেই, কলম্বস অমেরিকা আবিষ্কার করিয়া মনে

করিলেন ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্দেশীয়েরা শরীরে একরকম লাল রং মাখিত বলিয়া তাহাদের নাম রেড-ইণ্ডিয়ান করা হয়।

উত্তর-আমেরিকায় ইংরাজরা স্থায়ী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় এক শতাব্দীর কিছু অধিক সময়ের মধ্যে তেরটি বিভিন্ন প্রদেশ স্থাপিত হইল।

অশান্তির পূর্ব্বে শাসন-পদ্ধতি

প্রত্যেক প্রদেশের নিজের নিজের এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া অধিবাসীগণের মতামত লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের রাজা অধিবাসীদের কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলেন না। ফলে, রাজ্য-শাসনে, শিক্ষায় ও সমাজে অপ্রতিহত স্বাধীনতা-স্রোতে তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। আপনা আপনিই দেশে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। নির্ব্বাচনের দ্বারা শাসনকর্ত্তা নির্দ্ধারিত হইতে লাগিল। দিনের পর দিন এইরূপ স্বাধীনভাবে বাস করিয়া আমেরিকা-অধিবাসীদের স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয় হৃদয় আরও স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাদের এইভাবে স্বাধীন জীবন-যাপন বেশী দিন ঘটিল না। অচিরে দ্রুত উন্নতিশীল আমেরিকা-অধিবাসীদের উপর ইংলণ্ডের শ্যেন-দৃষ্টি পতিত হইল।

অশান্তির বীজ

ইংলণ্ড আমেরিকা-অধিবাসীদের লাভে ভাগ বসাইতে চাহিলেন। কাজেই অধিবাসীদের স্বাধীন শাসন-তন্ত্রের দিকেই তাঁহাদের প্রথমে নজর পড়িল। অকস্মাৎ শাসন-কার্য্যের অখণ্ড স্বাধীন-স্রোত বাধা পাইল। ইংলণ্ডের রাজা নিজে ইংলণ্ড হইতে শাসন-কর্ত্তা মনোনীত করিয়া পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বাধীনচেতা অধিবাসীরা ইহাতে অস্বোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

মানুষ মানুষকে দাস করিবার দারুণ লালসা-মত্ত হইয়া ভুলিয়া যায় মানুষকে মানুষ কখনও শক্তি দিয়া বশ করিতে পারে না। এক জাতির উপর অপর এক জাতীর শাসন, কোন কালেই শাসিতকে তুষ্ট করিতে পারে না। বৈদেশিক শাসনকর্ত্তা, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বরূপ অনিষ্টের মূল। নিজের শাসন কুশাসন হইলেও সহ্য হয়, তথাপি পরের শাসন যতই না কেন মঙ্গলময় হউক তাহা শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। বিদেশীর শাসন বিদেশীর স্বার্থই ষোল আনা দেখে। সুতরাং সেখানে সু-শাসন ভ্রান্তি মাত্র। বিজিত জাতির পরাজিতকে শাসন করিবার এই দুরন্ত অভিলাষই যুগে যুগে জগতে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ও করিবে। আমেরিকাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সংবাদ-পত্র দলন

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে 'কস্‌বে' নামক এক ব্যক্তি আমেরিকার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হ'ন। তিনি শাসন-কর্ত্তা হইয়াই অযথা অত্যাচারে দেশ উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, সেই সময়ে নিউইয়ার্কের একখানি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক 'পিটার জেঙ্গার' শাসন-কর্ত্তা 'কসবের' নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহাকে অবিলম্বে এই বে-আইনী এবং রাজদ্রোহ-জনক রচনার জন্য গ্রেপ্তার করা হইল, এমন কি জামিন পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। পরিশেষে নয় মাস মোকদ্দমা চলার পর তিনি মুক্তি পাইলেন। রাজ-আইনে তিনি দণ্ডিত হইলেন না বটে কিন্তু এই দীর্ঘ নয় মাস কাল বৃথাই হাজতে পঁচিয়া মরিতেছিলেন। জামিনে খালাস দিলে তাহাকে এই বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণের এই চেষ্টায় দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লোকে রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন

আরম্ভ করিয়া দিল। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলে জাতির একতার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। জনমতের মুখপত্র সংবাদ-পত্র। সুতরাং সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণ করা এবং জনমতকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা একই কথা। সার্ব্বজনিক বিষয়ে সাধারণের বাদানুবাদ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কনষ্টিটিউসনাল-সরকারের গঠন সম্ভবপর হইত না। বক্তৃতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাই রাষ্ট্রীয় ভাবের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমানে যদি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিশ্বের কোন অংশে আবশ্যকতা থাকে তবে তাহা ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ ভারতবাসীরা একে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তদুপরি আমলাতন্ত্র পরিচালিত ভারতের শাসনভারের প্রতিবাদ করিতে হইলে একমাত্র মুদ্রাযন্ত্রের সহায় ব্যতিরেকে দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহাই হউক আমেরিকায় ইংলণ্ডের দলন-নীতির প্রথম সূচনা সংবাদপত্র-দলন।

আমেরিকার দীক্ষাগুরু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

স্বাধীনতা আসে কি করিয়া? পৃথিবীতে যে সকল বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহাদের পশ্চাতে অনেক মনীষীর গভীর গবেষণা ও প্রাণপাত চেষ্টা দেখা যায়। জাতিকে তাহার জাতীয়তা মাতৃভূমি বিষয়ক জ্ঞান, ভক্তি এবং আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে তদুপযোগী সাহিত্য এবং ভাব-ধারার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। মানুষের কাজ তাহার চিন্তা-ধারার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং জাতিকে স্বাধীনতা অর্জ্জনে ব্রতী করিতে হইলে প্রথমে তাহার চিন্তাধারার জড়তা দূর করিয়া স্বাধীন এবং সরস করা প্রয়োজন।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

আমেরিকার এই চিন্তা-বিপ্লবের সুকঠিন ভার পড়িয়াছিল মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের উপর। মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকাকে স্বাধীনতার নূতন এবং সজীব চিন্তা-ধারার দ্বারা প্লাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারার মূলমন্ত্র ছিল—Unite or die অর্থাৎ হয় মিলন না হয় মৃত্যু। তাহার এই নীতি হইতে আমেরিকার নাম ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইয়াছে। আমেরিকা বেঞ্জামিনের প্রচারিত মিলনের মহামন্ত্র সম্যক অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তাই সে আজ স্বাধীন; কারণ আমেরিকার বিভিন্ন জনপদ সমূহ এবং বিভিন্ন জাতির মিলন ভিন্ন ইংলণ্ডের মহাশক্তিকে কখনই বিচ্ছিন্ন ভাবে বাধা দিতে পারিত না। আমাদের ভারতবর্ষেও নানা প্রদেশ, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানাজাতি হওয়ায় এক-মন এক-প্রাণে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে অভাব কণ্টক স্বরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে।

মহানুভব বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিতেন। দশ বৎসর বয়সেই বেঞ্জামিনকে পিতার এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। পরে তাঁহার এই কার্য্যে অমনোযোগ দর্শনে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ছাপাখানার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যে মহাপ্রাণ বিরাট কর্ত্তব্য-ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই! অচিরে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা জগৎকে বিস্ময়স্তব্ধ করিয়া দিল। পরবর্ত্তী কালে তিনি মহাপ্রাণ দেশ-হিতৈষী এবং প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক-রূপে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন।

এদিকে যখন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির চেষ্টায় দেশে নব জাগরণের

সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, দেশবাসী একতাবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে ঠিক তখন অপরদিকে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে বাঁধিবার জন্য

১৭৬৫খৃঃ ষ্ট্যাম্প-আইন

মামলা-মোকদ্দমায়, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বিবাহের কাগজ পত্রাদিতে বৃটিশ সরকারের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে, এই মর্ম্মে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প-আইন প্রবর্ত্তিত করিলেন। দেশের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। সবে মাত্র ফরাসীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। যুদ্ধে আমেরিকা ঔপনিবেশীকেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঋণ-ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর নূতন করভার স্থাপিত হওয়ায় তাহারা তাহাদের এই দুরবস্থায় ষ্ট্যাম্প-আইন রদ্ করিবার জন্য কাতর নিবেদন জানাইল। ইংলণ্ড তাহাদের এই ন্যায্য কাতর নিবেদনে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কাজেই দেশে অশান্তির মূর্ত্তি ঘনাইয়া উঠিল—এই অন্যায়ের প্রতিকারার্থে। (১)

দেশে যখন আগুন জ্বলিয়া উঠে তখন কোন একটি মাত্র কারণে জ্বলিয়া উঠে না। তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যায় জুলুমের পর জুলুমে কোন বিধি-সঙ্গত প্রতিকারের উপায় না পাইয়া বা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাহারা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের 'এক্স-লা চ্যাপেলের' সন্ধির পর হইতেই বৃটিশ সরকার ক্রমাগত আমেরিকাকে দাবে রাখিবার চেষ্টা করেন এবং তত্রত্য অধিবাসীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেদের অযথা আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে। ১৭৬১

---

(১) ভারতেও ইংরাজ ষ্ট্যাম্প-আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

খৃষ্টাব্দে আমেরিকার উপর "আমদানী শুল্ক" ধার্য্য করা হইল এবং তাহা আদায়ের জন্য কড়াকড়ি আরম্ভ হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বন্দরে আগত মাল বোঝাই জাহাজ সমূহ কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন। আমেরিকা কিছুতেই এই কর প্রদানে স্বীকৃত হইল না, অধিকন্তু ইহাকে অনায্য দাবী বলিয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, বিলাতে পার্লামেন্ট-মহাসভায় আমেরিকার প্রতিনিধি নাই। যে মহাসভায় আমাদের প্রতিনিধি নাই তাহার নির্দ্দেশ আমরা মানিয়া চলিতে বাধ্য নহি।

বৃটিশের অন্যায় প্রভুত্বকে তাহারা কোন মতেই মানিয়া লইতে পারিল না। আমেরিকাবাসীর এবম্বিধ মানসিক অবস্থার উপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে "ষ্ট্যাম্প-আইন" পাশ হইল। আমেরিকায় অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

এই "ষ্ট্যাম্প আইন"ই অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজকে আমেরিকার প্রভুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু গতির বিচিত্র ভঙ্গিমা মানুষের করায়ত্ত নহে। যে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে "ষ্ট্যাম্প আইনে" ইংরাজের আমেরিকা অধিকারে ভাঙন ধরিয়াছিল ঠিক সেই খৃষ্টাব্দেই বক্সার যুদ্ধ-বিজয়ী ইংরাজ ভারত সম্রাট সাহ্ আলমেরর দুর্ব্বল হস্ত হইতে মিত্রতার আবরণে বঙ্গদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। আমেরিকার লুণ্ঠনের দ্বার চিরতরে বন্ধ হইল, ভারতের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

গতির বিচিত্র ভঙ্গিমা

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে "ষ্ট্যাম্প আইন" কার্য্যকরী হয়। আমেরিকাবাসী উক্ত দিবসকে জাতির শোকের দিন মনে করিয়া দোকান-পাট ও কাজ-কর্ম্ম সমস্তই বন্ধ রাখে এবং যাহাতে "ষ্ট্যাম্প-আইন" কার্য্যতঃ চালান অসম্ভব হয় তাহারও চেষ্টা চলিতে থাকে। এক দিকে স্থানে স্থানে ষ্টাম্প কাগজ পোড়াইয়া

শোকের দিন

ফেলা হইল এবং বণিক-সম্প্রদায় ষ্ট্যাম্প-আইন রদ্ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ পণ্য আমদানী করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। অপর দিকে বণিক-জাতি ইংরাজের মূল স্বার্থে ঘা দিবার জন্য এবং দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি মনীষীর পরামর্শমত দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনকল্পে নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন হঠাৎ আকাশের কালো-মেঘ কাটিয়া গেল। ঘটনাচক্রে এই সময় আমেরিকায় "ষ্ট্যাম্প-আইন" বলপূর্ব্বক প্রচলনের প্রধান উদ্যোক্তা ইংলণ্ডের মন্ত্রী মিঃ গ্রেনভাইল পদত্যাগ করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে উদার হৃদয় স্বাধীনচেতা ও দূরদর্শী পিট মহোদয় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইলেন। মিঃ পিট মন্ত্রী হইয়াই "ষ্ট্যাম্প-আইন" রদ্ করিলেন। দেশ আবার শান্তির স্নিগ্ধ-চ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল।

এই শান্তি ও স্নিগ্ধতা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পরবৎসরই, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে চা, গ্লাস, শিসা, রং, কাগজ প্রভৃতি আমেরিকার আমদানীর

চা-কর

উপর তৎকালীন ইংলণ্ডের সচিব "রেভিনিউ এ্যাক্ট" নামে এক নূতন কর ধার্য্য করিলেন। কিন্তু পরে অন্যায্য কর আদায় করা অসাধ্য দেখিয়া চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স করিয়া কর নির্দ্ধারিত করা হইল এবং অন্যান্য পণ্যের উপর কর প্রত্যাহার করিলেন। দেশ পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, এই অত্যাচারের প্রতিকারার্থে প্রথম যথারীতি আবেদন নিবেদনের পালা চলিল। কিন্তু ইংলণ্ড দেশবাসীর এই কাতর নিবেদনের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমেরিকাকে তরবারীর বলে দমন করিতে উদ্যত হইলেন। ঔপনিবেশিকগণকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ১৭৬৮

খৃষ্টাব্দে দুই দল সৈন্য বোষ্টনে উপনীত হইল এবং ইংরাজ রণতরীর নাবিকেরা জনৈক আমেরিকাবাসীর একখানি নৌকা লুণ্ঠন করিল। উন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল উপস্থিত হইলে স্বভাবতঃই নানারূপ অকথ্য অত্যাচার যে হইয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। চারিদিকে অপ্রতিহত অত্যাচারের সংবাদ দিনের পর দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। হঠাৎ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ-পথে একদিন কতকগুলি স্কুলের ছাত্রের উপর গুলি চলিল। তাহার সপ্তাহ খানেক পরে সৈন্য-বারিকের সম্মুখ পথ দিয়া গম্যমান কতকগুলি লোকের উপর গুলি বর্ষিত হইল। গুলির আঘাতে তিন জনের মৃত্যু হইল এবং তিন জন আহত হইল। দৈনন্দিন এবম্বিধ পাশবিক অত্যাচারে দেশ যে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বরং উত্তেজিত না হওয়াই আশ্চর্য্য! দেশের লোক দলবদ্ধ হইয়া বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেই হইবে এবং তজ্জন্য সকলে হয় স্বাধীনতা অর্জ্জন নয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। ইহাকেই বলে স্বাধীনতার জন্য জাতির প্রাণের সত্যকার জাগরণ।

তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল চা-কর উঠাইতে না পারিলে চা আর খাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ-পণ্য বয়কট মন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন বন্দরে চা-বোঝাই এক জাহাজ উপস্থিত হইল। দেশবাসী একটি সভা করিয়া স্থির করিল চা-কর রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতেই চা নামাইতে দেওয়া হইবে না এবং পরে আবার ঠিক হইল ঐ চা সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। রাত্রি নয়টার সময় কতিপয় ভদ্রলোক আমেরিকার আদিম নিবাসী কুলীদের বেশ ধারণ করিয়া

জাহাজে আরোহণ করিল এবং ৩৪৫টী চা-র বাক্স সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। অকস্মাৎ এই ঘটনা ঘটায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল না সুতরাং রক্তপাত হইল না। ইহার পর হইতে চা-র জাহাজ উপস্থিত হইলেই দলে দলে লোক সমবেত হইয়া চা নামাইতে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই যে সকল চা দেশে আমদানী হইয়া জমা ছিল তাহা কেহ ক্রয় না করায় বাক্স বন্দী অবস্থায় পঁচিতে লাগিল।

ইংলণ্ড এই সংবাদে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। বোষ্টন এই ক্ষতির প্রতিশোধ লইবার জন্য বোষ্টন পোর্ট বন্ধ করিয়া দিলেন। "ম্যাসাচুসেটস এ্যাক্ট" পাশ করিয়া আমেরিকার অধিবাসীদের পূর্ব্ব সনন্দ সমূহের রদ করিলেন। বৃটিশ সেনাপতি কেজ্‌কে ৪ দল সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও সর্ব্বেসর্ব্বা নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইল। নানাভাবে আমেরিকাকে সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের অধীন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইংলণ্ড যতই করুন গোড়ায় ভুল করিলেন। কোন জাতিকে যে পশু-বলে শাসন করা চলে না এই সত্যটি ইংলণ্ডের শক্তি-মত্তা মস্তিষ্ক কিছুতেই বুঝিতে চাহিল না। ফলে ইংলণ্ডের অত্যাচারের মাত্রা অথবা দমনের প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়াই চলিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ফিনাডেলফিয়া কংগ্রেস আমেরিকার অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ একত্রিত হইয়া প্রকাশ্যেই ইংলণ্ডের আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব পাশ হইল। ইহার পরে আমেরিকাবাসী প্রকাশ্যেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

দেশে এই দুর্দ্দিনে আবির্ভাব হইল জর্জ্জ ওয়াসিংটনের। কোন

জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে—চাই জ্ঞান ও কর্ম্মের সংমিশ্রণ। সর্ব্ব-কালে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব অবস্থায় ইহাই জাতীয় জাগরণের মূলমন্ত্র। আমেরিকার স্বাধীনতার পথেও দুই মহান প্রাতঃস্মরণীয় বীর স্বাধীনতার এই দুই ( জ্ঞান ও কর্ম্ম ) মহামন্ত্র প্রচার করিয়া আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম করিয়াছিলেন—জ্ঞানবীর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, কর্ম্মবীর জর্জ্জ ওয়াসিংটন। পূর্ব্ব হইতেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও একতার আবশ্যকতা এবং প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত করভার সহিব না, ও প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত আইন কানুন মানিব না ইত্যাদি সারগর্ভপূর্ণ তথ্যগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় বিস্তার করিয়াছিলেন। আর আজ এই দেশের দুর্দ্দিনে ওয়াসিংটন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় জাতীর এই স্বাধীনতার প্রচেষ্টা কর্ম্মের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইল।

জর্জ্জ ওয়াসিংটন

জর্জ্জ ওয়াসিংটন এক দরিদ্র কৃষকের পুত্র ছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ার অন্তর্গত এক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে পাঠাভ্যাস করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার আর্থিক এবং সাংসারিক বিপদ তাঁহার প্রথম জীবনে উন্নতির পথে প্রতি পদে অন্তরায় হইয়াছে। এই অনটনক্লিষ্ট দরিদ্র বালকই ভবিষ্যতে যুক্ত-রাজ্যের প্রেসি-ডেন্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভূমি আমেরিকার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও কর্ম্মবহুল জীবন আমেরিকাবাসীর নিকট তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

ষোড়শ বৎসর সময় হইতে তিনি যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতে স্বাবলম্বন শিক্ষা করায় তাঁহার মনের ও দেহের দৃঢ়তা সাধিত

হইয়াছিল। এই দৃঢ়তা তাঁহার ভবিষ্যতের কঠিন সৈন্যজীবনে অনেক সহায় হইয়াছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর যখন ইংলণ্ড আমেরিকায় যুদ্ধ বাধিল তখন তাঁহার রণকৌশল ও দক্ষতা আমেরিকাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছিল।

ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসের পর হইতে আমেরিকাবাসী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল; এই সময় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিবাদ মিটাইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই শুভ চেষ্টায় ইংলণ্ড কর্ণপাত করিলেন না। উপরন্তু আমেরিকায় "অস্ত্র-আইন" জারি করা হইল। আমেরিকাবাসী লুক্কায়িতভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কনকর্ডে সমবেত হইবে লাগিল। আমেরিকার ইংরাজ শাসনকর্ত্তা মিঃ গেজ এই সংবাদ পাইয়া তাহাদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক আমেরিকা-বাসী কনকর্ডের জাতীয় সৈন্যদলকে প্রস্তুত হইবার অবসর দিবার জন্য সামান্যমাত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইংরাজের এই সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করিল। এই স্বদেশপ্রাণ যুবকদল প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিল কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল। কনকর্ডে জাতীয় সৈন্যদল সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়া ইংরাজ সৈন্যবাহিনীকে ঘোর যুদ্ধে পরাস্ত করিল। স্বাধীনতার চেষ্টারই জয় হইল।

যুদ্ধ আরম্ভ

কিন্তু ইংরাজ সহজে সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। বাংকার্স হিলে আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময় আমেরিকার জাতীয় সৈন্যদল সংখ্যায় মাত্র দেড় সহস্র ছিলেন। কাজেই আমেরিকা পরাজিত

এবং ইংরাজেরই জয় হইল। আমেরিকা যদিও পরাজিত হইল তথাপি তাহার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয়ে শত্রুপক্ষ ইংলণ্ডকেও বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে এয়ারেন নামক একজন সুদক্ষ সেতা নিহত হওয়ায় যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষাও আমেরিকাবাসী অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত এবং বেদনা অনুভব করিয়াছিল।

যাহাই হউক আমেরিকাবাসী কিছুতেই হতাশ হইলেন না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য কাজে লাগিয়া গেল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর কাল ক্রমান্বয়েই যুদ্ধ চলিয়াছিল। বাংকার্স-হিল যুদ্ধের পর আমেরিকার ফিলাডিলফিয়ার দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল এবং কংগ্রেস হইতে ইংলণ্ডে রাজার নিকট পুনরায় এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। ইংরাজ তখন সবেমাত্র বাংকার্গ-হিল যুদ্ধে জয় করিয়া জয়োল্লাসে তাহাদের আবেদন ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া মিঃ গেজকে পূর্ব্ববৎ যুদ্ধে চালাইবার আদেশ দিলেন। এইদিকে আমেরিকাবাসী ও নিশ্চিন্ত ছিল না। আমেরিকা-বাসী কর্ম্মবীর ওয়াশিংটনকে সেনাপতি পদে বরণ করিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটন সসৈন্যে বোষ্টন নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে ইংরাজ সেনাপতি মিঃ হোয়ের সহিত তাঁহার সংজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলেন। এই সংঘর্ষে ইংরাজ সেনাপতি সসৈন্যে অবরুদ্ধ হইলেন। পরে ইংরাজ সেনাপতি অবিলম্বে বোষ্টন নগর ত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে ওয়াশিংটন তাঁহাকে মুক্তি দিলেন এবং মহাসমারোহে বোষ্টন নগর অধিকার করিলেন। এই জয়ে উৎফুল্ল হইয়া আমেরিকাবাসী স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। ইহাতে আমেরিকাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইল।

কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা বলা যায় না। ইহার পরই লঙ্ দ্বীপে ওয়াশিংটন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় তাঁহার বহু সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেখানে পারিল গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ওয়াশিংটনকেও বহুদিন যাবৎ প্রাণের ভয়ে দেশ দেশান্তরে পলায়ন করিয়া গুপ্তভাবে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফিলা ডেলফিয়া হইতে কংগ্রেস সভা বাল্টিমোরে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল এবং ফিলা ডেলফিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ওয়াশিংটন সারোটোগার যুদ্ধে আসীম সাহসিকতার সহিত ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইংরাজের এই পরাজয়ে আমেরিকার ভাগ্যগগনের কালো মেঘ কাটিয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই ওয়াশিংটন ফিলা ডেলফিয়া পুনরুদ্ধার করিলেন। স্বাধীনতাগর্ব্বে আমেরিকা আবার হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিবাদ মিটিল না।

ফরাসীর মিত্রতা

এদিকে যখন আমেরিকায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন মহাপ্রাণ ফ্রাঙ্কলিন এই অনর্থক নরহত্যা রোধ করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু সেখানে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ইংলণ্ডের চিরশত্রু ফরাসীর নিকট গমন করিলেন। তৎকালীন ফরাসী সম্রাট যোড়শলুই ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অশেষ গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ্যে সাহায্য না করিলেও গোপনে সহায়তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সারাটোগার যুদ্ধে ওয়াশিংটনের বিস্ময়কর বীরত্ব এবং জয়লাভ করার সংবাদ পাওয়ার পর হইতে ফরাসী সম্রাট প্রকাশ্যেই আমেরিককে সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং আমেরিকাকে

স্বাধীন বলিয়া মানিয়া লইলেন (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ড আমেরিকার সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। কাজে কাজেই ইউরোপেও যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজ নিজের অদূর দর্শিতা ও শক্তি মত্ততার ফলে উভয় দিক হইতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সময় ফরাসীদেশ হইতে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া আমেরিকার সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। তন্মধ্যে জিলবার্ট লাফেটের নাম আমেরিকার ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ। তিনি নিজ ব্যয়ে ফ্রান্স হইতে আমেরিকায় আসিয়া সখের সৈন্যরূপে আমেরিকান জাতীয় সৈন্য-দলে কাজ করেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস ভার্জ্জিনিয়ায় বৃটিশ সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়া আমেরিকা গমন করেন এবং দেশে লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করেন। কর্ণওয়ালিস পরে নিউইয়র্কে সেনাপতি ক্লিন্টনের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থল পথে ওয়াশিংটন ও লাফেট পরিচালিত সৈন্যবাহিনী দ্বারা এবং জলপথে ডি, গ্রাসির পরিচালিত ফরাসী নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মিঃ কর্ণওয়ালিস সসৈন্যে অবরুদ্ধ হইলেন। ইংরাজের আমেরিকায় আধিপত্যের সকল আশা ফুরাইল। এই দুর্ঘটনার পর ইংলণ্ডের মন্ত্রী সচিব লর্ড নর্থ মন্ত্রি-পদ ত্যাগ করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে সার ওই, কারলটন প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বরাবরই তাঁহার আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি ছিল। সুতরাং সন্ধির চেষ্টা সহজেই সফল হইল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর আমেরিকাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড সন্ধি-পত্রে সাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে কানাডা, নভস্কোশিয়া এবং নিউ ফাউণ্ড-

ল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশ আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সন্ধিতে ইংলণ্ড-আমেরিকা যুদ্ধের অবসান হইল।

শাসন বিষয়ে পশু বল কত দুর্ব্বল তাহাই আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখা আছে। প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গেলে ও অত্যাচার উৎপীড়নের দ্বারা জাতিকে অধীন রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহার যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহাই শক্তি-মত্ত জাতির শিখা উচিত এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনে অত্যাচার উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিবার জন্য দুর্ব্বল জাতির বল সংগ্রহ করা উচিত। আজ আমেরিকায় স্বাধীন জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

# দাস জাতির স্বাধীন রাজ্য

## লাইবিরিয়া ।

লাইবিরিয়া দাস জাতির স্বাধীন রাজ্য। এই লাইবিরিয়া-বাসীরা এক পুরুষ বা দুই পুরুষ আগে সকলেই ইউরোপ ও আমেরিকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ক্রীতদাস ছিলেন। দাস প্রথা যে কি ভয়াবহ কি অমানুষিক তাহা অল্প বিস্তর সকলেই জানি। মানুষকে বাজারের পণ্য হিসাবে যেখানে বিক্রয় করা হইয়া থাকে সেখানে যে তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং অধিক কি প্রাণের প্রতিও কোনরূপ যত্ন লওয়া হইবে না তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে।

আমেরিকায় দিনের পর দিন অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্র ও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির অর্থই শ্রমজীবির আবশ্যকতা। কিন্তু আমেরিকার আদিম নিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানরা পাশ্চত্য জাতির আশানুরূপ শ্রম পরায়ণ না হওয়ায় আফ্রিকা হইতে কষ্ট সহিষ্ণু পরিশ্রমী নিগ্রোদের আমদানী করা আরম্ভ হইল। এই ব্যবসায়ের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন স্পেন ও পর্ত্তুগাল ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে।

তাঁহাদের দেখাদেখি লাভের মাত্রাধিক্যে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য জাতিও এই পৈশাচিক পন্থা অবলম্বন করিতে কসুর করিলেন না। এই ব্যবসায় তথা কথিত সভ্য জাতিরা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেন না। বল পূর্ব্বক হউক বা প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বকই হউক এই সকল দাস সংগৃহীত হইত। ইহাদের সংগ্রহের জন্য ৪০টি আড়কাটির কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত আড়াকুঠিগুলি দাস চালান দেওয়ার প্রধান আড্ডা ছিল। জাহাজ পূর্ণ করিয়া দাসদের আমেরিকার উপকূলে নামান হইত।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহামনা বিচারপতি জজ্ মানসফিল্ড সর্ব্ব প্রথম এই প্রথার উচ্ছেদ কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপের সর্ব্বত্রই দাস প্রথা রদ্ করিবার জন্য কঠিন আইন প্রচলিত হয়।

এই মাত্র বলিয়াছি দাস প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়; কিন্তু সত্যই কি দাস প্রথা উঠিয়া গিয়াছে?

দাসত্বের পট পরিবর্ত্তন

ইতিহাস লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হয় নাই শুধু আকৃতির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তথা কথিত পাশ্চত্য সভ্য জাতি সমূহ 'Indentured System' প্রবর্ত্তন এবং Immigration Act বিধি বদ্ধ করেন। এই Indentured system এ সহস্র সহস্র ভারতীয় কুলি মোরিটাস, বৃটিশ গিয়ানা, অষ্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা, জামিকা, ত্রিনিডাড্, নাটাল ও ফিজি দ্বীপে প্রেরিত হয়। এই Indentured system দাস প্রথা রদ্ হওয়ার মুখ্য ফল। দাস প্রথা

রদ্ হইল বটে কিন্তু পোষাক আর নাম বদলাইয়া আবার এই নূতন উপায়ে মানুষকে দাস করিবার হিংস্র প্রবৃত্তি সভ্য জাতিরা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

এই Indentured system এর কুফল ও অত্যাচারে ভারতের বাহিরে ভারতীয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতেও বিদেশী চা-করর৷ ভারতবর্ষে Agreement system বা চুক্তি প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। আসামের চা বাগানের কুলিরা এই Agreement কুলিদের 'এগিরিমিটী' কুলি বলে। আসামের চা বাগানের কুলিদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অযথা অত্যাচার তাহাদিগকে দাসের অধম করিয়া রাখিয়াছে। যাক এ সব অবান্তর কথা। আমার বক্তব্য এই যে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ হইয়াছে এক ভাবে এ কথা সত্য—বাজারে দাস বিক্রয় বিজ্ঞাপন বাহিরও হয় না, "দাস চাই" বলিয়া পথে ঘাটে হাঁকিতে শুনা যায় না সত্য কিন্তু বর্ত্তমানের এই পরিমার্জ্জিত ভাবে আইনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যে হাজারে হাজারে মানুষকে দাস করিয়া রাখা হয় তাহাও দাস প্রথার নামান্তর মাত্র অবস্থান্তর নহে। এই প্রথার ও উচ্ছেদ একান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

লাইবিরিয়ার প্রতিষ্ঠা

মুক্তির অব্যবহিত পরে দাস দাসীরা মহা সমস্যায় পড়িল। তাহারা বহুদিন যাবৎ সম্ভ্রান্ত পরিবারে ক্রীতদাস ভাবে থাকার পর হঠাৎ যখন স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার অধিকার পাইল এবং তাহাদের প্রভুরাও আইনের ভয়ে তাহাদিগকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন তখন তাহারা কোথায় যাইবে কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতেই পারিল না। তাহাদের

মধ্যে মুক্তি পাইয়াও অনেকে দাস জীবন বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দাস দাসী দিগের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থানাদির এবং জীবিকার্জ্জনের চিন্তা অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বাস্তবিকই অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে ইংলণ্ডে একটি "Antislavery" সভা ও আমেরিকায় Colonisation Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমে "সিরালয়োঁ" নামক এক উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেখানে ইংলণ্ডের মুক্ত দাস দাসীদের বসবাস করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ইহা আজও ইংরাজের অধীনে। ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া আমেরিকার Colonisation society ও আমেরিকার মুক্ত দাস দাসীর জন্য "সিরালয়োঁর" দক্ষিণ পূর্ব্বে "লাইবিরিয়া" নামক এক উপনিবেশ স্থাপিত হয় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা লাইবিরিয়াকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লাইবিরিয়া বাসী দাসেরাও গত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর পর্য্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত তাহাদের রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহারা আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের আদর্শ লইয়া লাইবিরিয়ায় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। লাইবিরিয়ার দেশের স্বত্ব স্বামীত্বে কেবল কৃষ্ণ জাতিরই অধিকার; শ্বেত জাতির কোন অধিকার থাকিবে না। তাহারা এই আইন প্রণয়ন করিয়া শ্বেত জাতির দর্পচূর্ণ করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই যে কালার ধলা পার্থক্য এবং শ্বেত জাতির উৎকৃষ্টতা তাহা আজ এই স্বাধীন দাস জাতির হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে। স্বাধীনতাই জাতিকে সম্মানার্হ করে। কালা ধলা আমাদের পরাধীনতার ফল মাত্র।

লাইবিরিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাস বলিতে গিয়া স্বতঃই

আমাদের ভারতের দৈন্য এবং বন্ধনের কথা মনে পড়ে। লাইবিরিয়ার দাস জাতি মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী কাল সভ্য জাতির সংস্পর্শে স্বাধীন ভাবে থাকিয়া নিজেদের শাসনযন্ত্র নিজে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু আমরা ভারতবাসী দেড় শত বৎসর কাল মহাশক্তিশালী ইংরাজের অধীনে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াও কেন আমরা আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলাম না। কেন রাজপ্রতিনিধিরা বলিয়া থাকেন "ভারত আজও তাহার শাসন-যন্ত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিবার উপযোগী হয় নাই," ইহার অর্থ কি?

আমাদের গৌরবময় অতীত, বর্ত্তমানে দিনের পর দিন নব নব জগৎ স্তব্ধকারী মনীষির আবির্ভাব এবং গত মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর যুদ্ধে অসীম দক্ষতা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন, কিসের অভাবে আমরা উপযুক্ত হই নাই?

ইহার উত্তরের জন্য বেশী বেগ পাইতে হয় না। ভারতের অফুরন্ত ধনরত্ন, প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তাশ্রমিক ও জনবল বৃটিশসিংহ ত্যাগ করিতে চাহিবেন কেন? কারণ তাহা হইলে জগতে তাঁহার আর শ্রেষ্ঠ শক্তির আসন অধিকার করা চলিবে না। সুতরাং ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে আবেদনে বিবেদনে হইবে না কারণ আবেদন নিবেদনে স্বার্থের কঠিন দ্বার উন্মুক্ত হয় না। ভারতকে এই স্বার্থের পথে বাধা সৃজন করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের স্বার্থ ভারতের রক্তমাংসের সহিত জড়িত কাজে কাজেই দেখিতে হইবে কাহারা দেশের রক্তমাংস, দেশের জীবনীশক্তি। গণশক্তিই দেশের জীবনীশক্তি এবং রক্তমাংস। এই গণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

## কিউবা-দ্বীপ

কিউবার প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। তবে যখন হইতে ইউরোপের সহিত কিউবার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন হইতেই তাহার ইতিহাস জানা যায়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কিউবা প্রথম কলম্বসের নয়নপথে পতিত হয়। কিউবা প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য্য ও সম্পদের ভাণ্ডার স্বরূপ। কি শস্য সম্পদে, কি সৌন্দর্য্যে কিউবা অতুলনীয়। কিউবার সুখ সমৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ হইয়া স্পেনীয় নৃপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতাধিক সৈন্য লইয়া কিউবাতে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

কিউবার ইতিহাস

তদবধি কিউবা বারংবার বিদেশী শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হয়। অবশেষে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যে একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধিদ্বারা কিউবা সম্পূর্ণরূপে স্পেনের কর্তৃত্বাধীন হয়। তদবধি কিউবার শাসন দণ্ড পরিচালনার জন্য স্পেন হইতে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিত। এই শাসনকর্ত্তাই স্পেনের রাজপ্রতিনিধিরূপে কিউবা শাসন করিতেন।

স্পেন কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াও বহুদিন যাবৎ কিউবাবাসী কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। হয়ত করিবার কিছু ছিল না অথবা তাহারা পরাধীনতার ব্যথায় জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার অবসর পায় নাই। যাহাই হউক ইতিহাস বলে যে কিউবা স্পেন অধিকারে প্রথম প্রথম কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কিউবার রাজধানী হাভানা সহরের অন্তর্গত জেসুমারিয়া পল্লী ভস্মসাৎ হয় এবং প্রায় ১২ হাজার লোক গৃহশূন্য, আশ্রয় হীন হয়। চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ভরা কিউবারে শ্মশানে পরিণত করিল। কিউবার অশান্তির এই প্রথম সূত্রপাত।

বিপদ একা আসে না। ঠিক এই সময়ে স্পেনেও গোলযোগ উপস্থিত হইল। স্পেন-রাজবংশ নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইল। শাসন যন্ত্রের মূলকেন্দ্রে এইরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়ায় কিউবার শাসন কর্ত্তারাও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। জুলুম এবং অন্যায় কর আরোপের দ্বারা অর্থ শোষন করিয়া নিজেদের পকেট পূর্ণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেই দেশে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। মানুষে সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই আর সহ্য করিতে পারে না। মুষ্টির বিরক্তি ও রাজদ্রোহ বলপূর্ব্বক দমন করা যাইতে পারে কিন্তু যখন সমগ্র জাতি অপর এক জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া স্বাধীনতার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে তখন তাহাকে কোনশক্তিই রোধ করিতে পারে না। কিউবা বাসীরও তাহাই হইল।

ক্রমেই যখন অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল দেশবাসী তখন রাজকীয় অত্যাচারের কোন প্রতিকারের উপায় না পাইয়া বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ইহার ফলে দেশে উপর্য্যুপরি বিদ্রোহ আরম্ভ হইল ;—যথা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ব্ল্যাক ঈগল ষড়যন্ত্র, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে. নারশিখো লোপেজের ষড়যন্ত্র ও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য হইতে ৬০০ শত সৈন্য সহ লোপেজের পুনরায় আক্রমণ।

বিদ্রোহে শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচারের মাত্রা কমে না বরং বৃদ্ধিই পায়। কারণ শাসক সম্প্রদায় শক্তি মত্ততার ঠুলির মধ্য দিয়া বিদ্রোহ দমনের সত্য পথটি দেখিতে পান না। তাঁহারা দমনমূলকনীতির দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিবেন মনে করেন। কিন্তু এই নীতির দ্বারা বিদ্রোহ

সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও মূল যে নষ্ট হয় না বরং আরও দৃঢ় হয়, এই সত্যটি কিছুতেই শক্তি মত্ত শাসক সম্প্রদায় বুঝিতে চাহেন না। স্পেন সরকারও এই ভুল করিলেন। কিউবার দিনের পর দিন স্পেন সরকারের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশেও অশান্তি ও বিদ্রোহের বৃদ্ধি হইয়াই চলিল। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ এতদূর পাশবিক আকার ধারণ করিয়াছিল যে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট সহৃদয় পোক্ সাহেব কিউবাবাসীর দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া দশ লক্ষ ডলার (প্রতি ডলার তিন টাকার উপর) মূল্যে কিউবা দেশ ক্রয় করিতে চাহেন। কিন্তু স্পেন সরকার তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই দেশবাসীর উপর অত্যাচার পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে "জাঞ্জন" নামক স্থানে কিউবাবাসী ও স্পেনের সহিত এক সন্ধি হইল। তাহাতে স্পেনীয় দিগের সহিত কিউবাসীর সমান অধিকার স্বীকার করা হইল। এই উপায়ে সেবারকার মত কিউবায় স্পেন অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। দেশে লুপ্ত শান্তি ফিরিয়া আসিল।

সন্ধি সমানে সমানেই সম্ভব। বাঘে-হরিণে কোনদিন এক ঘাটে জল খাইয়াছে? যেখানেই এইরূপ ভক্ষক ও ভক্ষ্যের অসম্ভব প্রীতির প্রস্তাব হইয়াছে সেখানেই দেখা গিয়াছে—ভক্ষক ভক্ষ্যকে নিজের কবলের মধ্যে আনিয়া অধিকতর আয়াসে নির্ব্বিঘ্নে ভক্ষণ করিবার জন্যই এইরূপ অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই স্পেন সরকার 'জাঞ্জনের' সন্ধি সর্ত্ত অমান্য করিলেন। দেশবাসী শাসন যন্ত্রের উচ্চপদ

অত্যাচারের পুনঃপ্রবর্ত্তন।

সমূহ হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল। তাহার পরিবর্ত্তে স্পেনীয়রা নিযুক্ত হইতে লাগিল। আর যে দু চার জন দেশবাসী রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই স্পেন-সরকারের ধামা ধরা এবং দেশের ও দশের শত্রু। ক্রমাগত অত্যাচার করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ও নৈতিক ও মানসিক অবনতি ঘটিতে লাগিল। ইহাতে প্রজার মনে বিদ্বেষের সহিত ঘৃণারও উদ্রেক হইতে লাগিল।

একদিকে যেমন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল অপর দিকে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অধঃপতনেরও সীমা পরিসীমা ছিল না। চিনির ব্যবসায় বহু কিউবাবাসী জীবিকা অর্জ্জন করিত। কিন্তু হঠাৎ চিনির দর কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইল। এই সময়ে দাস ব্যবসা রহিত হওয়াতেও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল। কিউবাবাসীর এই দুঃসময়ে স্পেন-সরকারের কোনরূপ সাহায্য করা দূরের কথা পরন্তু কিউবা হইতে ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায় করিবার জন্য চারিদিকে অকথিত অত্যাচার অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ; রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক হ্রাস করা হইল। স্পেন তাহাদের নিজের সামরিক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ক্লিষ্ট দেশবাসীকে গুরু কর ভারে পীড়িত করিতে লাগিল। প্রকাশ্যে সরকারের দাবী হিসাবে এই সকল অত্যাচার সংঘটিত হইতে লাগিল। রাজ কর্ম্মচারীরাও এই সুযোগে নিজেদের উদর পুষ্টি করিতে যে কসুর করেন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। এত অত্যাচার করিয়াও স্পেন-সরকারের সাধ মিটে নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কিউবায় একটি

পাশবিক লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিল, যাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

"কতকগুলি স্কুলের বালক, জনৈক স্পেন-রাজকর্ম্মচারীর কবরের প্রস্তর-ফলকের উপর কয়েক ছত্র অসম্মানসূচক কবিতা লিখিয়া আসিয়াছিল। সন্দেহ করিয়া বালকদের তিন জন নেতাকে স্পেনীয়গণ গ্রেপ্তার করিল এবং সেই তিন জন বালককে গুলি করিয়া মারা হইল।"

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া স্পেন-সরকার উপর্য্যপরি আবার দুইটি সন্ধি করিলেন। সময় বুঝিয়া এই সন্ধিদ্বয়ও পূর্ব্ববৎ স্পেনীয়রা অমান্য করিলেন।

কিউবাবাসীর এই সঙ্কটে স্বদেশ-সেবক যোশী-মার্টির আবির্ভাব হয়। বিদেশীর অত্যাচারে অনাচারে দেশের বুকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে যে ব্যথা গুমরিতেছিল, যোশী সেই ব্যথার সহিত প্রাণ সংযোগ করিয়া সমগ্র জাতিকে পূত স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বর্ত্তৃতায় ও উপদেশে জাতি জাগিল। অধীনতা পাশ হইতে দেশের মুক্তি কামনা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিল। যোশীর অধিনায়কত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু যোশীর এই প্রাণপাত চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মহাপ্রাণ যোশী ধৃত হইলেন এবং রাজ আইনে তাঁহাকে গুলি করিয়া নিহত করা হইল। কিছুদিনের জন্য কিউবার স্বাধীনতার গতি প্রতিহত হইল।

যোশী-মার্টি

জাতি জাগিলে কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। ১৮৯৬

খৃষ্টাব্দে "জারা" নামক স্থানে কতকগুলি লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন—জেসাস রাবির। প্রথম প্রথম স্পেনীয়রা এই বিদ্রোহকে সমগ্র জাতির বিদ্রোহ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্রমেই বিদ্রোহ যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল স্পেন-সরকার ব্যস্ত হইয়া জেনারেল ক্যাম্পসের অধীনে কিউবায় এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তখনও হয়ত শাসন পদ্ধতির সংস্কার করিলে বিদ্রোহ প্রশমিত হইত কিন্তু স্পেন-সরকার তাহা না করিয়া দমন মূলক নীতি অবলম্বন করিলেন। দেশীয়গণ স্পেনের শাসন অমান্য করিয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। কাজেই দেশে দ্বৈত শাসন আরম্ভ হইল। এই অসহায় অবস্থায় স্পেনীয় সৈন্যগণ কতক আহারাভাবে এবং কতক পথ ঘাট না চেনার দরুন বিদ্রোহীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না; যদি চ স্পেনীয় সৈন্যগণ সংখ্যায় বিদ্রোহীদের দশগুণ ছিল।

বিদ্রোহ

স্পেন সরকার নিজের এই অক্ষমতায় একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। জেনারেল ওয়াইলার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুন সংখ্যক সৈন্য লইয়া কিউবায় উপস্থিত হইলেন। দেশে অত্যাচারের সীমা পরিসীমা রহিল না। ওয়াইলার কিউবায় পৌঁছিয়াই গ্রামের পর গ্রাম সৈন্য দ্বারা ঘেরাও করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা এই ভাবে অবরুদ্ধ করার উদ্দেশ্য—যাহাতে বিদ্রোহীরা নিজ নিজ গৃহ হইতে কোনরূপ সাহায্য না পায়। বরং আত্মীয় কুটুম্ব, মাতা স্ত্রীকে এই ভাবে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া বিদ্রোহীরা স্বতঃ

অত্যাচারী ওয়াইলার

প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম সমর্পন করিতে বাধ্য হয়। এই সব অবরুদ্ধ গ্রাম সমূহে হাজারে হাজারে নর-নারীকে হত্যা করা হইল; স্ত্রীলোকদের ইজ্জত নষ্ট করা হইল; ঘড় বাড়ী শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা হইল। অবশেষে পশু ওয়াইলার সৈন্যদের এমন পর্য্যন্ত আদেশ জারি করিয়াছিলেন যে,—পথে মানুষ দেখিলেই গুলি করিবে। কিউবা শ্মশানে পরিণত হইল।

কিউবার প্রতি এই অত্যাচারে সমগ্র সভ্য জগত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে স্বাধীনতার প্রতীক যুক্তরাজ্য স্পেনের প্রতি অতি মাত্রায় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিয়তির চক্রে সে সময় এমন কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইল যাহাতে যুক্ত রাজ্যের আন্তরিক এই ধূমায়িত অসন্তোষ ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশন রূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া স্পেনের অত্যাচারের হাত হইতে কিউবা-বাসীকে রক্ষা করিল।

যুক্তরাজ্যের সমবেদনা ও সহায়

অত্যাচারী ওয়াইলার যুক্তরাজ্যের বিদ্রোহীদের অস্ত্র-শস্ত্র আসিতেছে সন্দেহ করিয়া একখানি জাহাজ ধৃত করিলেন এবং আরোহীদের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ করিলেন। অবশ্য পরে তাঁহাকে এই জাহাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

আবার ঠিক এই সময়েই স্পেনীয়গণ একজন কিউবা বাসীকে গ্রেপ্তার করেন। ইনি যুক্ত রাজ্যের একজন Naturalised অধিবাসী অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে কিছু কাল বাস করিয়া ইনি যুক্তরাজ্যের অধিবাসী রূপে গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং ইঁহাকে গ্রেপ্তার করায় যুক্তরাজ্য প্রতিবাদ করিল। আবার ভাগ্যক্রমে এই বন্দী আবদ্ধ অবস্থাতেই মারা যান। কাজেই আকস্মিক এই মৃত্যুতে যুক্তরাজ্যের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

ইতিমধ্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ব্যাঙ্কো কিউবার আসিয়া আবদ্ধ নর-নারী গণকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু জেনারেল ওয়াইলারের অত্যাচারে ঘর দুয়ার শস্যক্ষেত্র সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে সুতরাং সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত নর-নারী থাকিবেই বা কোথায় আর খাইবেই বা কি? ব্যাঙ্কো কিউবায় স্বায়ত্ব-শাসন ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কিউবা বাসী ব্যাঙ্কোর এই সমস্ত সদয় ব্যবহার সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহারা স্পেনীয়দের কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সমস্তই একটা প্রতারণার জাল বলিয়া তাহাদের চক্ষে প্রতিভাত হইল। ব্যাঙ্কো যখন এই ভাবে দেশে শান্তি স্থাপনে চেষ্টা করিতেছিলেন সে সময় হঠাৎ একখানি যুক্ত রাজ্যের যুদ্ধ জাহাজ হাভানার বন্দরে জলমগ্ন হইল। যুক্তরাজ্য আর সহ্য করিল না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল।

কিউবার স্বাধীনতা লাভ।

যুক্তরাজ্যের তৎকালীন মহানুভব প্রেসিডেন্ট 'ম্যাককিনলে বরাবরই কিউবার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া কিউবাকে স্পেনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। যুক্তরাজ্য ও স্পেনে যুদ্ধ বাধিল। অবশেষে উভয় পক্ষের বহু হতাহতের পর সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে স্পেন ও যুক্ত রাজ্যের মধ্যে অনেক সর্ত্ত স্থাপিত হইল, তন্মধ্যে কিউবা যুক্তরাজ্যের শাসনাধীন হইবে ইহা তাহার অন্যতম। যাহাই হউক যুক্তরাজ্যের পরবর্ত্তী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কিউবাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে এক সন্ধি হয় তাহাতে কিউবা

বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাজ্যকে মানিয়া চলিতে হয়। যাহাই ঘটুক কিউবা এখন স্বাধীন, এবং যুক্তরাজ্য তাহার পৃষ্ঠপোষক।

## ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়রা এই দ্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কার করেন এবং ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের লোলুপ দৃষ্টি ও একবার পড়িয়াছিল বলিয়া ইতিহাস বলে। পর বৎসর ইংরাজ ও স্পেনের মধ্যে এক সন্ধি হয়। তদবধি স্পেন নির্ব্বিবাদে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর আধিপত্য করিয়াছেন।

ইতিবৃত্ত।

২৬শ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারেই এই দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীর নাম 'ম্যানিলা'।

এখানে প্রকৃতি দেবী তাঁহার স্নেহসার দানে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। এই দ্বীপপুঞ্জের জমি বিশেষ উর্ব্বরা। নানা ফল পুষ্প-ভারে বৃক্ষরাজি সর্ব্বত্রই শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। এখানে রবার, তামাক, কফি, কোকো ও ইক্ষুর চাষ অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। খনিজ সম্পদে ও

সম্পদশীল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ এবং পাথুরে কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যে দেশে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের এত প্রাচুর্য্য তাহা যে পরধন লোভী তথা কথিত সভ্য জাতির হিংস্র কবলে পতিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের স্থান কোথায়?

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তিন শত বৎসর পর ফিলিপাইন বাসী স্পেনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। দেশবাসী প্রজা সাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচারই এই মনোভঙ্গের কারণ।

স্পেনের পতন

চারিদিকে অত্যাচারের নিরবিচ্ছন্ন স্রোতে দেশ উৎসন্নে যাইতে লাগিল। দেশে রাজকীয় অত্যাচার ও ধর্ম্ম যাজকের অনাচার এক সঙ্গে দেখা দিল। রাজ কর্ম্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল। নূতন নূতন কর বসাইয়া জনসাধারণকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। একদিকে এই সমস্ত অন্যায় কর আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর যথেচ্ছ বল প্রয়োগ হইতে লাগিল। অপরদিকে ধর্ম্ম যাজকদের ধর্ম্মের ভানে পরের স্ত্রী কন্যার উপর অনাচার অত্যাচারে দেশ ভাসিতে লাগিল। দেশের লোক এইরূপ দ্বিবিধভাবে উৎপীড়িত হইয়া রাজ দরবারে নানারূপ আবেদন নিবেদন করিল কিন্তু তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করিল না। বরং অত্যাচারের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইল। যে সকল দেশহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ষড়যন্ত্রকারী এই মিথ্যা দোষারোপ করিয়া গ্রেপ্তার করা হইল। এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১৯৬

জন। আমরা কলিকাতায় কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার ঘটনায় শুনিয়াই শিহরিয়া উঠি। আর সেদিন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সভ্যতার দিবালোকে সুসভ্য স্পেনীয়রা ১৯৬ জন ফিলিপাইন বন্দীকে ভূনিম্নে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রকোষ্ঠের একটি মাত্র গবাক্ষ ছিল তাহাও শান্ত্রীরা বন্ধ করিয়া দিল।

বন্দিগণ সকলেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণী। কাজেই পরদিন প্রভাতে দেখা গেল ৫৪ জন মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এবং অবশিষ্ট মুমূর্ষ বন্দিগণকে রাজার পৈশাচিক আইনে গুলি করিয়া বধ করিবার আদেশ হইল। অবশেষে তাহাদের গুলি করিয়া মারা হইল। তাহাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ স্পেন-সরকার দিতে পারেন নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় আজ বাংলা দেশেও সুসভ্য ইংরাজ শাসনে অর্ডিনান্স আইনের কঠিন নিষ্পেষণে বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাঙালী যুবক বিনা বিচারে সুদূর পল্লীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তিলে তিলে প্রাণ দিতেছেন।

নৃশংসতার-চরম

ইহাতেই অত্যাচারের শেষ হয় নাই। দেশবাসীর ভাগ্যে আরও দুর্দ্দশা ছিল। এই অন্ধকূপ হত্যার পরই ১৩ জন ভদ্র লোক গ্রেপ্তার হইলেন। এই ভদ্র লোকদের মধ্যে জমীদার; ব্যবসায়ী, ডাক্তার, রাসায়নিক এমন কি দুইজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও ছিলেন! তাঁহাদিগকেও পূর্ব্ববর্ত্তী আসামীদের ন্যায় ঘাতকের গুলিতে প্রাণ দিতে হইল।

হত্যার পর হত্যায় দেশের লোক ক্রমশই বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হইয়া

উঠিল। রাজ কর্ম্মচারীরাও অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধিই করিতে লাগিলেন। দেশবাসী নিরুপায় হইয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক সভা করিলেন—উদ্দেশ্য দেশের দুর্দ্দশার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করা। গুপ্ত চরের কৃপায় নানাভাবে রঙীন হইয়া এই খবর রাজকর্ম্মচারীদের কানে গেল। সভা আরম্ভ হইলে হঠাৎ একদল অস্ত্রধারী সৈন্য আসিয়া নিরস্ত্র ভদ্রলোকদের উপর হিংস্র পশুর মত দয়ামায়া হীন হইয়া গুলি বর্ষণ করিল। সভামণ্ডপেই অনেকে নিহত হইলেন; অবশিষ্ট যাঁহারা ধরা পড়িলেন তাঁহাদিগকেও পরে গুলি করিয়া মারা হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই সভাভঙ্গের ব্যাপার সংঘটিত হয়।

এই সব হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস ব্যভিচার অপেক্ষাও স্পেনীয় রাজকর্ম্মচারীদের পাশবিক মনোবৃত্তি আমাদের মনকে অধিক পীড়া দেয়। রাজপুরুষরা এই সকল হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচারের জন্য গর্ব্ব ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদের স্বদেশবাসী ভাইয়েরা ও এই সকল নর হন্তারকদের মহাসমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিতেন। মানুষের মনোবৃত্তি প্রভুত্ব দর্পে কতদূর পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ইহাই তাহার চরম নিদর্শন। ভারতবর্ষেও নরঘাতক জেনারেল ডায়ারকে এই সঙ্গে মনে পড়ে। সুসভ্য জাতিদের মনে রাখা উচিত হত্যা সমর্থনকারীরাও হত্যাকারীর মতই ভয়াবহ ও দোষী এবং হত্যাপ্রেম পশুত্ব মনুষ্যত্ব নহে।

দেশবাসী স্পেনের এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। চারিদিকে বিদ্রোহের আয়োজন চলিতে লাগল। ফিলিপাইন বাসীর এই অকুল পাথারে দুইজন মহাপ্রাণ বীর আসিয়া দেশের হাল ধরিলেন। স্বদেশ উদ্ধারই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইল। এই দুই মহাপুরুষের এক জনের

নাম আগুনাল্ড, অপর জনের নাম রাইজে। তাহাদের আবির্ভাবে দলে দলে কাতর দেশবাসী আসিয়া তাঁহাদের সহায় হইল। সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপাইনে স্পেনের আসন টলিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ প্রেমিক আগুনাল্ড জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিলিপাইনের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ২৭ বৎসর তখন স্বদেশ বাসীর উপর বিদেশীর অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে মন প্রাণ সমর্পন করেন। একদিকে তাঁহার জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগ অপরদিকে তাঁহার স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রচেষ্টা সমস্ত ফিলিপাইন বাসীকে মুগ্ধ করিল। দলে দলে আসিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে লাগিল। আগুনাল্ড অকুতোভয়ে দেশবাসীর নিকট বিদেশীর অত্যাচারের কাহিনী ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচনা করিতে লাগিলেন। নানাভাবে আগুনাল্ড দেশীয় জনসাধারণের হৃদয়ের সুপ্ত প্রেরণা জাগরিত করিতে সমর্থ হইলেন। দেশবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ঠিক এই সময়ে স্পেন সরকার কিউবাতে ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ফিলিপাইন বাসীর এই সময়োচিত বিদ্রোহ ঘোষণায় কিঞ্চিত ভীত হইয়া পড়িলেন।

আগুনাল্ড

স্পেন সরকার উভয়দিক হইতে এই সঙ্কটে পড়িয়া আগুনাল্ডকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিবার জন্য রাজকোষ হইতে বিশ লক্ষ ডলার (প্রতি ডলার তিন টাকার কিছু উপর) প্রদান করিলেন। বিদ্রোহ চালাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাবে বিদ্রোহে অকৃতি অনিবার্য্য। তখন আগুনাল্ডের হাতে টাকা মোটেই ছিল না এবং ব্যক্তিগত ভাবে টাকার লোভ ও তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণে প্ররোচনা

দিয়াছিল। ফিলিপাইনের স্পেনীয় শাসনকর্ত্তা সরকার প্রদত্ত বিশ লক্ষ ডলার মুদ্রার মাত্র আট লক্ষ টাকা দিয়া আগুনাল্ডকে নিরস্ত করিলেন এবং অবশিষ্ট টাকা নিজে আত্মসাৎ করিলেন।

আপাততঃ বিদ্রোহ থামিয়া গেল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে আবার অত্যাচার আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে সভা ভঙ্গের যে ভীতি প্রদ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি তাহা বিদ্রোহ থামার এক বৎসর পরে ঘটে।

আগুনাল্ড সেই সময়ের জন্য শান্ত হইলেও পরবর্ত্তী জীবনে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের জন্য বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিক কি তাঁহার মস্তকের জন্য স্পেন সরকার পঁচিশ হাজার ডলার মুদ্রা পারিতোষিক ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি ভয় পান নাই।

জগতের স্বাধীনতার ইতিহাসে দেশবন্ধু রাইজেল একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জমীদার গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একাধারে সুকবি, সুলেখক, সুবক্তা ও স্বদেশভক্ত বীর ছিলেন।

দেশবন্ধু
মিঃ রাইজেল

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পরিণত বয়সে তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধে যে সকল সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা ফিলিপাইন বাসী ঔৎসুক্যের সহিত পড়িয়া থাকে। তাঁহার "ফিলিপাইনের ইতিহাস" প্রথম সভ্য জগতকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি ইউরোপে গিয়া স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিলিপাইনে তখন অত্যাচারের নিরবিচ্ছিন্ন স্রোত অবাধ গতিতে চলিতেছে। দেশের এই দুর্দ্দশায় মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইয়া তিনি মানুষের জন্মগত দাবী স্বাধীনতার জন্য দেশ বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজ-গুপ্ত-চরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল।

তিনি প্রতিপদে বাধা পাইয়া বুঝিলেন যে বর্ত্তমান জগতে কোন নিপীড়িত, বিদেশী শক্তির দ্বারা পদদলিত জাতিকে যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয় তবে ঘরে বাইরে প্রচার একান্ত প্রয়োজন। কারণ জগতের বিবিধ স্বাধীন জাতিতে অন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ দিন দিন এমন কঠিন হইয়া উঠিতেছে যে, বিদেশী স্বাধীন জাতির সহানুভূতি পাইলে স্বাধীনতার পথ অনেকটা সুগম হয়। বিচক্ষণ রাইজেল এই সব চিন্তা কয়িয়া দেশত্যাগী হইলেন।

কিছুকাল জাপান ও লণ্ডনে বাস করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহের সূচনা হয়। স্পেন সরকার তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়াইয়া গ্রেপ্তার করিলেন। প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বিচার হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রমান পাওয়া গেল না এবং রাজ কর্ম্মচারীরা রাইজেলের নির্দ্দোষিতা প্রমানের চেষ্টাকে মোটেই আমল দিল না। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

রাইজেলের হত্যা ব্যাপার একটি করুণ হৃদয়বিদারক রোমান্স। তিনি ব্রাকেন্ নাম্নী এক যুবতীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। রাইজেলের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ পাইয়া যুবতী ব্রাকেন ছুটিয়া আসিলেন। তখন রাইজেলের মৃত্যুর আর দুই ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে। এই শ্মশান

শয্যায় উভয়ের পরিণয় যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের অনতিকাল পরেই মহাপ্রাণ রাইজেল ঘাতকের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ব্রাকেনের ধমনীতে আইরীশ রক্ত প্রবাহিত ছিল। তার উপর তিনি মহামতি রাইজেলের প্রণয়িনী। স্বামীকে এইরূপ অসহায় ভাবে পিশাচ-

বিদ্রোহ

দের হাতে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার রমণী হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিধান করিলেন এবং সসস্ত্র হইয়া বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দেশ বিদেশে স্পেন সরকারের নৃশংশ অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করিতে লাগিলেন।

দেশময় বিদ্রোহ জ্বলিল। মার্কিন ফিলিপাইন বাসীর দুঃখে সহানুভূতি সম্পন্ন এবং স্পেনের নৃশংস ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই সুযোগ দেখিয়া মহামতি আগুনাল্ড ৫০ সহস্র দেশী সৈন্য লইয়া মার্কিনকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। আগুনাল্ড টাকা পাইয়া দেশকে ভুলিয়া যান নাই। উৎকোচরূপে প্রাপ্য অর্থের অতি সামান্য অংশ নিজের জন্য রাখিয়া বেশীর ভাগই এই সেনাদল গঠন করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক স্পেন সরকার এই ধাক্কা সহ্য করিতে পারিলেন না। স্পেনীয়রা ফিলিপাইন হইতে বিতাড়িত হইলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দেশে

সাধারণ তন্ত্র।

সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আগুনাল্ড ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিলিপাইন বাসীর মুক্তি সমরে সাহায্য করিবার জন্য সেনাপতি ডিওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। ফিলিপাইন বাসী যখন স্বাধীন সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল তখন মার্কিন সেনাপতি কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না। কারণ তখন তাঁহার সৈন্যবল অতি যৎসামান্যই ছিল। নব বলে বলীয়ান জাগ্রত ফিলিপাইন বাসী ও বিচক্ষণ কর্ম্মবীর আগুনাল্ডের বিরুদ্ধাচরণ করার তখন মার্কিন সেনাপতির সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তিনি কিছুকালের জন্য নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করিলেন। পরে যুক্তরাজ্য হইতে উপযুক্ত সাহায্য উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সেনাপতি ডিওয়ে আগুনাল্ডকে বন্দী করিলেন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাজ্যের অধিকারভুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল।

যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আজও ফিলিপাইন বাসী স্বাধীনতা পায় নাই। মার্কিনের শক্তি শৃঙ্খলে বদ্ধ। আন্দোলনের বিরাম নাই। ক্রমাগত স্বাধীনতার দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সদাশয় মার্কিন সরকার কিছুতেই ফিলিপাইন বাসীকে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। আর যে ভাবে মার্কিনের হাওয়া-গাড়ীর টায়ার টিউবের জন্য রবারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ফিলিপাইনের স্বাধীনতা লাভ সুদূর পরাহত সন্দেহ নাই। কারণ ইহার ক্ষেত্রে যে রবার উৎপন্ন হয় তাহাতে মার্কিনের প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ হইয়া থাকে। ফিলিপাইন মার্কিনের কামধেনু। মার্কিন কি ইহা সহজে পরিত্যাগ করিবেন ?

বর্ত্তমান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

## স্বাধীনতার সংগ্রাম

সেদিন মার্কিনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কুলিজ কর্ণেল টমসনকে ফিলিপাইন বাসীর স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইয়াছে কি না, পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল টমসন পরিষ্কার ভাষায় কুলিজকে জানাইয়াছেন ফিলিপাইন বাসী যতই আন্দোলন করুক এখনও তাহাদের স্বাধীনতা দিবার উপযুক্ত সময় হয় নাই। কর্ণেল টমসন ফিলিপাইনের পেট্রিয়ট ম্যানুয়েল কোয়জনের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহার প্রতি কথায় মার্কিনের স্বার্থের দিক ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

মার্কিন জগতে প্রচার করিয়া থাকেন যে, তাঁহার স্বাধীনতা প্রিয় উদার জাতি। বহুকষ্টে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন সুতরাং স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন। কিন্তু হায়! স্বার্থ বড় চীজ।

## ফরাসী বিপ্লব।

ফরাসী জাতিকে আজ নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের শেষভাগে অনেক পাশ্চত্য জাতি এখানে আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে ইংরাজ ও ফরাসীই প্রধান। কিন্তু কালের গতিতে ইংরাজ ভারতে প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হইলেন। ফরাসী পারিলেন না। এখনও ভারতে পণ্ডিচেরী, কালিকট, মাহী, ইয়ানন্ ও চন্দন ফরাসীদের অধিকারে রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে ফরাসী রাজ্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

## স্বাধীনতার সংগ্রাম

ফরাসী জাতি বড় ভাব-প্রবণ জাতি। ফরাসী দেশে ঘন ঘন অন্তর্বিপ্লবে রক্ত-স্রোত বহিয়াছে। রাজবংশ সিংহাসন চ্যুত হওয়ার পর ও ফরাসী দেশে তিন তিন বার জনতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের ইতিহাসকে একটা একটানা বিপ্লবের ইতিহাস বলা যাইতে পারে

ফরাসী দেশের বিপ্লবের বিভীষিকাময় ঘটনা সমূহ পড়িলে স্বতঃই মনে হয় কেন ফরাসী দেশে বিপ্লবের পর বিপ্লব একটানা গতিতে চলিয়াছে ? ফরাসী দেশ কোন বিদেশী জাতির শাসনভারে ত' পীড়িত নহে ? তবে কেন এই বিপ্লবের দাবাগ্নি ? রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হইল কিন্তু তবু বিপ্লবের বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না কেন ? দেশে জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ও দুইবার জনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া নূতন জনতন্ত্র গঠিত হইল কেন ?

ফরাসী বিপ্লবে কেবল এই কথায় প্রতিপন্ন হয় যে বিদেশীর অধীনতা শুধু অধীনতা নহে। যেখানে মানুষের বা সাধারণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় বা খর্ব্ব করার চেষ্টা হয় তাহাই অধীনতা। আর এই ক্ষুণ্ণ করা বা খর্ব্ব করার চেষ্টা একটা সীমার বাঁধ না মানিয়া শুধু গায়ের জোরে বা তরবারির দৌলতে শাসন করিতে চাহিলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী দেশে যখন প্রথম জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ফরাসী জাতি কোন বৈদিশিক রাজার অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিল না। স্বদেশের স্বাধীন নৃপতিগণই তখন অপ্রতিহত ভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন এবং সহস্র বৎসরের সম্মানিত প্রাচীন রাজবংশই তখন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রাচীন রাজবংশের নির্ম্মূল করিয়াই প্রথম ফরাসী জনতন্ত্র স্থাপিত হয়।

( যাহাই হউক ) এই ফরাসী বিপ্লবের একটা ঐতিহাসিক বিবরণ এখানে উপস্থিত করিব।

বহু প্রাচীন কাল হইতে ফরাসী দেশে 'ফিউডেল' প্রথা প্রচলিত ছিল। 'ফিউডেল' প্রথা অনেকটা আমাদের দেশের জমিদারী প্রথার মত। ফরাসী দেশে বুরবোঁ রাজবংশের আবির্ভাবের সঙ্গে 'ফিউডেল' প্রথা প্রায় লোপ পায়। এই বুরবোঁ বংশের প্রথম নৃপতি হেনরী ঠমের সময়ে ( ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ) ভারতবর্ষের সহিত ফরাসীদের প্রথম পরিচয়।

বুরবোঁ বংশ চতুর্দ্দশ লুইএর সময়ে শক্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুই রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে জনসাধারণের সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফিউডেল লর্ডদের ক্ষমতা একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাজ্যের অবস্থা

রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি ফিউডেল লর্ডদের হাতে বিক্ষিপ্ত ছিল। চতুর্দ্দশ লুই রাষ্ট্রের এই বিক্ষিপ্ত শক্তিকে রাজ সিংহাসন তলে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য ফিউডেল লর্ডদের শক্তি কাড়িয়া লইলেন। তিনি এইভাবে রাজশক্তিকে সেই সময় শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টায় ফিউডেল লর্ডরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। সুতরাং চতুর্দ্দশ লুই ফরাসী রাজ্য সুগঠিত ও রাজবংশকে সর্ব্বে সর্ব্বা করিবার পথেই রাজবংশ ধ্বংসের বীজ বুনিয়া গেলেন। এইভাবেই ফরাসী বিপ্লবের প্রথম অঙ্কুর বহির্গত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়াও যুদ্ধ বিগ্রহে যখনই রাজকোষ শূন্য হইত তখনই প্রজার উপর যথেচ্ছ কর বসাইয়া প্রজার রক্ত শোষণ করিতেন।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র পঞ্চদশ লুই সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি অত্যাচারে পিতাকেও অতিক্রম করিয়া ছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই রাজশক্তির অপব্যবহার ত' করিলেনই তদুপরি তাঁহার চরিত্র দোষ, অমিতচারী স্বভাব এবং বিলাস প্রিয়তার ফলে রাজকোষ শূন্য হইতে লাগিল। এই সুযোগে তোসামদকারীরা নানাভাবে স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিল। দিনের পর দিন দুরভিসন্ধিপরায়ণ কর্ম্মচারিগণের ও উপপত্নীর চক্রজালে পতিত হইয়া তাহাদের হস্তে তিনি ক্রীড়া-পুত্তলি স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং প্রজার দুর্দ্দশার অবধি রহিল না!

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ষোড়শ লুই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফ্রান্সের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ষোড়শ লুই পিতার মত অমিতাচার ও চরিত্রহীনতা দোষের—উত্তরাধিকারী না হইলেও দেশের সেই বিপর্য্যস্ত অবস্থায় সম্রাট হইবার উপযুক্ত দক্ষতা ও মেধার তাঁহাতে একান্ত অভাব ছিল। কাজেই প্রজার হিতসাধনে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারেন নাই। নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে স্বীয় পত্নী মেরী আনতোঁনেটীর পরামর্শই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। মেরী আনতোঁনেটী গর্ব্বিতা ও অদূরদর্শী নারী ছিলেন। আনতোঁর বিষময় নীতি ভবিষ্যতে তাঁহার স্বামী ও তাঁহার নিজের উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক হইয়াছিল। চারিদিকে অরাজকতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রজা পীড়নের মাত্রা কিছুমাত্র লাঘব হইল না। বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ষোড়শ লুইএর শাসন সংস্কারের চেষ্টা বিফল হইল।

ফিউডেল লর্ড সম্প্রদায় কি ভাবে রাজশক্তি হারাইয়াছিলেন তাহা

পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই লর্ড সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি হারাইয়া তোষামদকারী সভাসদে পরিণত হইলেন। কোনরূপ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাঁহাদের থাকিল না। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা পূর্ব্বতন লর্ড সম্প্রদায়ের সুবিধা ও দাবীগুলি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই তাঁহারা প্রকৃতশক্তি চ্যুত হইয়া অধীনস্থ রায়তের উপর অন্যায় দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন। নিত্য নূতন কর বসিল। মজুরদের বলপূর্ব্বক নিজের কাজে লাগানো হইতে লাগিল। বিবিধ উপায়ে নিজেরই রাষ্ট্রের পাওনা রাজস্ব ফাঁকি দিতে লাগিলেন। মরিতে মরিল শুধু গরীব প্রজা।

(খ) ফিউডেল লর্ড সম্প্রদায়

মধ্য যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রচার অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। আজও প্রাচ্য ভূখণ্ড ধর্ম্মের প্রভাব কাটাইতে পারে নাই। ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগ করিয়া এক অপূর্ব্ব সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ সমূহে রাজনীতি ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইয়াছে।

গ) ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম যাজকেরা এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক কুকার্য্য পরস্বাপহরণ করিতেন। তাঁহারা সাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে মোটেই দৃকপাত করিতেন না। কি সে তাঁহাদের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে তাহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান চিন্তা। তৎকালে ফরাসীদেশে ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের বাস ছিল। এই ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের মধ্যে ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার অভিজাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা অবশিষ্ট সমস্তই সাধারণ লোক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বিরাট সাধারণ সংখ্যার তুলনায়

ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় নিতান্ত মুষ্টিমেয় হইলেও এই মুষ্টিমেয়েরই অধিকারে ছিল দেশের তিনি পঞ্চমাংশ জমি এবং অবশিষ্ট মাত্র দুই পঞ্চমাংশ জমি ছিল সংখ্যায় বিরাট জনসাধারণের অধিকারে। তদুপরি জনসাধারণের অংশে বেশীর ভাগই অনুর্ব্বর ও জলাভূমি পড়িয়াছিল। ধর্ম্ম-যাজকগণের এই প্রকারের স্বার্থপরতায় জন-সাধারণ দিন দিন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

প্রকৃত পক্ষে ফরাসীদেশে এই সময় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় বাদেও মুখ্যভাবে অভিজাত ও সাধারণ প্রজা এই দুইটি সম্প্রদায় ছিল। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি দেশের জমিতে ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কতদূর আধিপত্য ছিল। ইহা ছাড়াও রাজ্যের বড় বড় চাকরীগুলি অভিজাত সম্প্রদায় টাকার জোরে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সেখানে সাধারণ লোকের কোন স্থান ছিল না।

(ঘ)অভিজাত সম্প্রদায়

অভিজাত সম্প্রদায় অর্থবলে বলীয়ান হওয়ায় গরীব সাধারণের নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য দরিদ্র সাধারণকে 'বেগার' খাটিতে হইত ; নীচ বংশজ বলিয়া নানারূপ অবজ্ঞার ভাজন হইতে হইত। কাজে কাজেই দেশের মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি জন সাধারণের বিদ্বেষ ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে ফরাসী দেশ বর্ত্তমানের মত কারখানা-শিল্পে ও বিজ্ঞানে তত অগ্রসর হইতে পারে নাই। তখন শতকরা বেশীর ভাগই ছিল চাষী এবং শিল্পের অধিকাংশই গৃহ শিল্প। যে দেশে চাষীর সংখ্যা অধিক অথচ জমি যাহারা নিজ হাতে চাষ করে না তাহাদের হাতে, সেখানে চাষীদের দুঃখের যে অবধি থাকিবে না তাহাতে আর সন্দেহের স্থান কোথায়? মজুরদের

(ঙ) চাষী ও মজুর।

সম্বন্ধেও তথৈবচ। তখন ইউরোপের মজুর শ্রেণী আজ কালকার মত সংঘ বদ্ধ ছিল না। সুতরাং বিশৃঙ্খল মজুর শ্রেণীকে শোষণ করিতে ধনিক শ্রেণীর কোন রকম কষ্ট পাইতে হইত না। মজুরদেরও বাধ্য হইয়া অতি অল্প মজুরীতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হইত। এমন কি প্রায়ই তাহাদের 'বেগার' খাটিতে হইত। চাষীরা যে জমি-জমা গ্রহণ করিত আপন ইচ্ছানুসারে তাহা চাষাবাদ করিবার অধিকার হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হইত। দেশের বেশীর ভাগ যাহারা ( চাষী ও মজুর ) তাহাদের এই হীন অবস্থার উপর নানারূপ কর ভার চাপানো হইয়াছিল যথা 'টলী,' 'সোবেলী', কোরভী ইত্যাদি। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ দেশে দুর্ভিক্ষ চির বিরাজমান ছিল। দেশের বেশীর ভাগ লোক ক্রমে এই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় আসিতে পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেশের যখন এই অবস্থা তখন যে বিপ্লব আসিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে ?

সাধারণ প্রতিষ্ঠান

দেশে দমন নীতি পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। 'লোকাল' গভর্ণমেন্ট-গুলির অধিকার সম্পূর্ণ অপহরণ করা হইল। পঞ্চদশ লুইএর প্রধান মন্ত্রী ( পার্লামেন্টকে ) জাতীয় মহাসভাকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন।

আইন ব্যবসায়ীর দল

সকল দেশেই আইন ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ বড় লোক হইয়া থাকে। ফরাসী দেশের তৎকালীন জাতীয় মহাসভার প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন আইন ব্যবসায়ীরা সুতরাং অধিকার ক্ষুণ্ণ করায় আইন-ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কারণ ইহাতে সরাসরি তাঁহাদের স্বার্থে ঘা লাগিল।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

বিপ্লবের পূর্ব্বে ফরাসী দেশে দুইটি দল দেখা দিয়াছিল—একটি রাজার দল, অপরটি জন-সাধারণের দল। রাজ সম্পর্কে সম্পর্কিত, অভিজাত সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম যাজক সম্প্রদায় লইয়া রাজার দল গঠিত। মুটে মজুর, চাষী ও মধ্যবিৎ লইয়া জন সাধারণের দল। রাজার দল সর্ব্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন আর জন সাধারণেরা সর্ব্ব প্রকারে উৎপীড়িত হইবার সনন্দ পাইলেন। রাজার দল স্বেচ্ছামত যেখানে সেখানে কর আদায় করিতে পারিতেন। রাজার দলের পরামর্শ অনুসারেই রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। রাজ্যের সমস্ত বিভাগই তাঁহাদের করায়ত্ব ছিল। রাজার দলের লোকেরা মনে করিতেন তাঁহারা শাসন করিতেই জন্মিয়াছেন এবং জন-সাধারণ নির্ব্বিকার চিত্তে হুকুম তামিল করিতেই জন্মিয়াছে। এই প্রভুত্বের ধারণা বদ্ধ মূল হওয়ায় জন-সাধারণকে পশুতুল্য মনে করিতেন।

জন সাধারণের প্রকৃত অবস্থা

মানুষকে যাঁহারা পশু জ্ঞান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁহাদের বৃত্তি যে পাশবিক হইবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এই রাজার-দলের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিবার স্থান এখানে নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইতিহাসের পাতায় তাহার ভূরি ভূরি নিদারুণ ঘটনা দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তৎকালে ফরাসী দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তবে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ তন্মধ্যে অতি ভয়াবহ। ফসল কাটিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে হঠাৎ শিলাবৃষ্টি হইয়া সকল ফসল নষ্ট হইল। রাজকোষ অর্থশূন্য। দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন চেষ্টাই রাজ পক্ষ হইতে হইল না।

দুর্ভিক্ষ

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চতুর্দ্দশ লুই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই অনেক অর্থ যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যয় করেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্চদশ লুই ইন্দ্রিয় সেবায় ও বিলাস ব্যসনে যথেচ্ছ রাজ ভাণ্ডারের অর্থক্ষয় করেন। তৎপরে ষোড়শ লুইএর অদূরদর্শী মহিষীর অদূরদর্শিতায় ও আমেরিকা-স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য কল্পে
বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। এই ভাবে রজেকোষ একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইল; সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে বেতন পাইতেছে না, পরান্নপুষ্ট রাজপোষ্যবর্গের ভারে সরকার ভারাক্রান্ত। কারেন্সীতে মুদ্রা নাই। শুধুই নোট চলিতে লাগিল।

দেশে যখন এই অরাজকতা তখন তাহা দূরীকরণের জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। টারগট, নেকার, ক্যালোন ওব্রায়েন প্রভৃতি মন্ত্রীগণ দেশের শৃঙ্খলা পুনস্থাপনের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতে ক্রুটী করিলেন না কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হইল না।

চিন্তাই কর্ম্মের জননী। চিন্তা বলিতে অবশ্য গবেষণা বুঝিতে হইবে। কারণ কি করিব, কেন করিব ও কি ভাবে করা উচিত ইহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের প্রেরণা চিন্তা হইতেই আসিয়া থাকে। এই পুস্তকে আমরা যে কয়টি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইয়াছি তাহার প্রত্যেকটিতেই পাঠক হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে তাহাদের জাগরণের পশ্চাতে ছিল কতকগুলি মনীষির প্রাণপাত চিন্তা।

সাহিত্যের প্রভাব

কোন সময়ে কি করিতেহইবে, কোন দেশের জল বায়ুতে কি করিলে সুবিধা হইবে তাহা জানিবাব জন্য মনীষিদের গবেষণার প্রয়োজন।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে তাহাকে সেই ভাবের ভাবুক করিয়া তুলিতে হইবে। দেশ বলিতে কোন একটি পার্থিব স্থূল কিছু বুঝায় না অথচ দেশ বলিতে দেশের জীব জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও জড় জগৎ কোনটাই বাদ পড়ে না। এই যে দেশাত্মবোধ ইহা শুধু চিন্তার দ্বারাই আসিতে পারে। আর আপনারা সকলেই জানেন যে দেশাত্ম বোধ না আসিলে দেশ স্বাধীন হইতেই পারে না।

দেশাত্মবোধ কথাটি ঠিক স্পষ্ট বুঝা যায় না। সুতরাং একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন রাজ কর্ম্মচারী 'খ'কে অর্ডিনান্স আইনে গ্রেপ্তার করিল। 'খ' এর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ইহাতে রাজ শাসনে বিরক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে সপ্তকোটি বাংলার অধিবাসী চঞ্চল হইয়া উঠিল যদিও তাহাদের সহিত 'খ' এর কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। আবার মনে করুন কৃষকদের উপর সরকার একটি নূতন কর বসাইলেন। ইহাতে কৃষক ন্যায়তঃবাদ সাধিতে পারে কিন্তু অকৃষক, যাহাদের সহিত জমির কোন সম্বন্ধই নাই তাহারাও তীব্র প্রতিবাদ করিল। কেন? ইহাকেই বলে দেশাত্মবোধ।

দেশের প্রত্যেক জিনিষের সহিত এমন কি প্রত্যেক ধূলি কণার সহিত আমার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে এই জ্ঞানই দেশাত্মবোধ। এই দেশাত্ম বোধ হাতে পাইবার জিনিষ নয়। ইহা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। সাহিত্যের প্রভাবই এই দেশাত্মবোধ জাগরণের একমাত্র সম্বল। কারণ সাহিত্যই জ্ঞানের বাহন। ফরাসী সাহিত্য ফরাসী বিপ্লবের একটি মূল কারণ।

# স্বাধীনতার সংগ্রাম

ফরাসী দেশবাসী ক্রমান্বয়ে অত্যাচারের পর অত্যাচারে যখন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল তখন সাহিত্য এই নৈরাশ্যপীড়িত জাতিকে এক নূতন আলোক প্রদান করিল। এই সময়ে মনটেসকিউ, ভলটেয়ার, এনসাই-ক্লোপিডিষ্ট, টারগট, হেলভেটিরস্, হলব্যাক ও রুসো প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

মনীষিরা সকলেই চলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফরাসীদেশে মনটেস্‌কিউ এই মনীষিদের মধ্যে প্রথম পথ প্রদর্শক।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে মনটেস্‌কিউ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনিই প্রথম ফরাসী দেশে মিশ্র-শাসন পদ্ধতি প্রচলনের উপদেশ দেন অর্থাৎ দেশের আইন-সভা সাধারণ নির্ব্বাচনে গঠিত করিয়া সমগ্র সভাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং এই সভা দ্বয় রেসপন্সিবল বা ঝুঁকি সহা মন্ত্রীর আদেশ অনুসারে পরিচালিত হইবে। রাজ্যের শোভার জন্য নামে মাত্র রাজা থাকিবেন। তাঁহার কোন প্রকৃত ক্ষমতা থাকিবে না। মনটেসকিউ 'স্পিরিট অব-ল' নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে দেশের অবস্থা বুঝিয়া তিনি ব্যবস্থা করিতে ও গ্রীসের আত্ম ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেশকে অনুপ্রানিত করিতে চেষ্টা করেন।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ভল্টেয়ারের জন্ম হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি বলিতেন প্রজার হিতের জন্য রাজা। দেশের শাসন পদ্ধতি যদি রাজা বা রাজসম্পর্কীয়দের অথবা বিশিষ্ট শ্রেণীর সুবিধার উদ্দেশ্যে কাজ করে তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। শাসন-পদ্ধতির জন-

সাধারণের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা কার্য্য করা উচিত। তৎকালীন ফরাসী শাসন পদ্ধতির দোষ দেখাইয়া ভল্টেয়ার প্রজা সাধারণের পক্ষাবলম্বন করিয়া শাসন কার্য্যকে বিদ্রূপ করেন। চতুর্দ্দশ লুই এর চরিত্র সম্বন্ধে বিদ্রূপ করায় তাঁহাকে কারাদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা প্রাণপণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্য প্রচারের জন্য বহুবার তাঁহাকে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মধ্বজীদেরও সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই।

রুসোঁকে পলিটিক্স জগতে এক নূতন ভাবের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। তাঁহার চিন্তা ফরাসী বিপ্লব অতিক্রম করিয়া আধুনিক জগতের বিপ্লবের ইতিহাসে ও অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার রচিত 'সমাজ দেহের পরিণতি বাদ' (সোসিয়াল কনট্রাক্ট থিওরি) চিন্তা জগতে এক নূতন স্রোত আনয়ন করে।

পূর্ব্বকালে রাজাকে ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। কাজেই রাজার কার্য্যকলাপ ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিচারে জনসাধারণ ভগবানের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইত। তাহার কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিত না। রাজা তাঁহার কার্য্যের জন্য কোন মানুষের নিকট দায়ী ছিলেন না। তাঁহার ন্যায়ান্যায়ের বিচার ভগবানের দরবারে হইবে। এই ছিল জনসাধারণের বদ্ধ মূল ধারণা। এই ধারণার বশীভূত হইয়া প্রজারা অত্যাচারী রাজার অত্যাচার উৎপীড়ন মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিত। অত্যাচারী নৃপতিও প্রাণের সুখে প্রজার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হইতেন না।

## স্বাধীনতার সংগ্রাম

রুসো রাজার এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এই একমুখী শাসনের রিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। 'সমাজদেহের পরিণতিবাদ' গ্রন্থে তিনি দেখাইলেন—দেশের এই একমুখী শাসন এবং রাজার একাধিপত্য ভগবানের অভিপ্রেত নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানুষ স্বাধীন। মানুষের জন্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কাহারও পক্ষে ন্যায্য বা মঙ্গলময় ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সমাজদেহের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষ সমবেত হইয়া প্রত্যেক মানুষ তাহার বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র অধিকার রাজার হাতে দিয়াছে। রাজা যদি সেই অধিকারের অপব্যবহার করেন তবে ন্যায়তঃ প্রজাসাধারণ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া উপযুক্ত শাসনপদ্ধতির পূর্ণগঠন করিতে পারে। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতি প্রজাসাধারণ মানিয়া চলিবে না। সুতরাং তৎকালীন অত্যাচারী নৃপতিদের পরিবর্ত্তে তিনি প্রজাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি প্রচলন করিতে উপদেশ দেন। দেশের অবস্থা ও প্রজাসাধারণের মানসিক ভাবগতির অনুযায়ী শাসন প্রণালী প্রচলিত হওয়াই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। রাজার যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করা প্রজার পক্ষে পাপজনক।

অত্যাচারে অত্যাচারে দেশবাসী তখন একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায়। সুতরাং তাঁহার এই সকল ভাবোদ্দীপক চিন্তাধারায় সহজেই জনসাধারণ আকৃষ্ট হইল। রুসো ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডিডেরো, হেল-ভিটিসস, টরেগট ও হলব্যাক প্রভৃতি মনীষিরাও নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লোকের মনে রাজ-অত্যাচারের বীভৎসতা এবং স্বাধীনতা লাভের আশা সঞ্চার করেন।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ডিডেরো ও ডি এলাম-বার্টের অধ্যক্ষতায় 'এন্সাই ক্লোপিডিয়া' নামক এক গ্রন্থ প্রণীত হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মানুযায়ী, মানুষ তাহার পাপের ফল ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই গ্রন্থ তাহার প্রতিবাদ করিয়া মানুষের ক্রমোন্নতিবাদ প্রচার করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও ইতিহাস প্রভৃতি কি ভাবে উন্নত করা যায় তাহার আলেচনা করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে গ্রন্থ প্রণয়নের অনতিকাল পরে 'এনসাই-ক্লোপিডিষ্ট' নামক একটি দল গড়িয়া উঠে।

ফলতঃ তৎকালীন সাহিত্যিকরা দেশে তাঁহাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহারা সমস্বরে প্রচার করেন যে প্রকৃতির নিয়মে কোন উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই। এই শ্রেণীবিভাগ মানুষের কৃত। একই মানবজাতির ভিতরে অনিয়ম থাকিতে পারে না। স্বাধীনতা সকলেরই জন্মগত অধিকার। কেহ কাহারও স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না। সকলেই স্বাধীন। স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই কাম্য।

বিপ্লবের সূত্রপাত

ক্রমে দেশে যখন অশান্তিচিহ্ন ঘনাইয়া আসিল তখন রাজা ষোড়শ লুই ব্যস্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত 'ষ্টেটশ্ জেনারেল' মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারসেলিস নগরে এই সভা আহূত হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

'ষ্টেটস্ জেনারেল' ফরাসী দেশের প্রাচীন 'মহাসভা'। 'ষ্টেটস জেনারেল মন্ত্রণা সভায় ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ হইতে নির্ব্বাচিত

প্রতিনিধির স্থান ছিল। চিরকালই এই সভায় ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক থাকিত। কাজেই এই সভায় সাধারণের কোন রকম আধিপত্য ছিল না। পূর্ব্বেই ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়কে রাজার-দল নামে অভিহিত করিয়াছি পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। সুতরাং এই মন্ত্রণা সভা যদিও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিতে পূর্ণ ছিল তথাপি যাহারা দেশের বেশীর ভাগ অর্থাৎ 'গণ' তাহাদের দুর্দ্দশার কোনরূপ লাঘব হইত না।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনে দেশের মন্ত্রণা সভার গঠনে এইরূপ অসামঞ্জস্য থাকিলে সাধারণকে কোন মতেই শান্ত করা যাইবে না বুঝিতে পারিয়া তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্র সচিব 'নেকার' সাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অপর দুই শ্রেণীর (ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত শ্রেনী) সংখ্যার যোগফলের সমান করিলেন। এই ভাবে 'ষ্টেটস জেনারেল' মন্ত্রণা সভায় সাধারণের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মন্ত্রণা সভায় সাধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ভারসেলিসে আহূত 'ষ্টেটস জেনারেল' মন্ত্রণা সভায় স্বতঃই দুইটি দল গড়িয়া উঠিল—রাজার দল ও জন সাধারণের দল। এই উভয় দলের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় মূল মন্ত্রণা সভা হইতে 'ন্যাসানাল এসেম্বলী' বা 'জাতীয় সমিতি' উদ্ভূত হইল। এই 'জাতীয় সমিতি' সম্পূর্ণ সাধারণ দলের প্রতিনিধিতে পরিপূর্ণ। প্রধান মন্ত্রী নেকার, ল্যাংগুইনেস, রবসিপরি, মারাট, ল্যাফেটী এবং অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই জনসাধারণের দলে যোগ দিলেন। এই জাতীয় সমিতি প্রথমতঃ রাজার ঋণদাতাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন এবং দেশের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

এই 'জাতীয় সমিতি' ষোড়শ লুই এর অপ্রতিহত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। প্রস্তাব হইল বৃটিশ শাসন প্রণালীর অনুকরণে শাসন প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করা হউক। কিন্তু তাহাতে রাজ ক্ষমতার হ্রাস পাইবে এবং বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ হইবে বুঝিয়া ষেড়শ লুই তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। বরং 'জাতীয় সমিতি'র সহিত অভদ্র ব্যবহার করিলেন এবং 'জতীয় সমিতি'কে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জন সাধারণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা সভায় যে সময় দলাদলি চলিতেছিল তখন শাসন যন্ত্রের বাহিরেও বহু 'ক্লব' বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা প্রকারে দেশের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছিল। ঐ সকল ক্লবের মধ্যে ভারসেলিস সহরের 'ব্রেটন ক্লব' ও প্যারিসের 'জ্যাকোবিন' ক্লবই প্রসিদ্ধ। 'জাতীয় সমিতি' এবং ক্লব প্রভৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশে সাধারণ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা।

রাজা ষোড়শ লুইএর দুর্ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা সভায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারিদিকের আন্দোলনে রাজা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন এবং প্রজাকে ভয় দেখাইয়া দমন করিবার অভিপ্রায়ে জার্ম্মানি ও সুইজারলণ্ড হইতে ভাড়াটিয়া সৈন্য আমদানী করিলেন। ইহাতে দেশের লোক আরও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। রাষ্ট্রীয় সচিব নেকার রাজার এই অন্যায় কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করায় মন্ত্রীত্ব পদ হইতে বিতাড়িত হইলেন। দেশের লোক জয় জয় ধ্বনি করিয়া নেকারের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিল। নেকারকে সম্মান প্রদর্শন করা ছাড়া এই

শোভাযাত্রার অন্য কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু রাজ পক্ষ নানারূপ অহেতুকী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিলেন। এই গোলমালে হঠাৎ রাজপক্ষের জনৈক ফরাসী দেহরক্ষী একজন জর্ম্মন সৈন্যের গুলিতে নিহত হইল। দেশময় রব উঠিল রাজা বিদেশী সৈন্যের সহায়ে দেশবাসীকে দমন করিবেন। এই গুজবে ক্ষিপ্ত হইয়া বহু ফরাসী সৈন্য জাতীয় দলে যোগ দিল। অপরদিকে অন্নক্লিষ্ট ও বেকারের দলও সোৎসাহে জাতীয় দলে যোগ দিল। সুতরাং প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্যারিসের উন্মত্ত জন-সাধারণ এবং সৈন্যদল ব্যাষ্টিল দুর্গ অধিকার করিল। এই দুর্গ বুরবোঁ রাজাদের অত্যাচারের রঙ্গভূমি ছিল। কত লোক এই দুর্গে আজীবন রাজবন্দী অবস্থায় কাটাইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুকাল যাবৎ এই দুর্গ অরাজকতা ও অত্যাচারের জন্যই দেশময় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বিপ্লব আরম্ভ হইতে না হইতেই এই অরাজকতার প্রতিকৃতি ব্যাষ্টিল দুর্গ বিদ্রোহীদের অধিকৃত হইতে দেখিয়া ফরাসীদেশের রাজা ষোড়শ লুই প্রাণের ভয়ে জনসাধারণের হস্তে আত্মসমর্পন করিয়া সাধারণ তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। ব্যাষ্টিল দুর্গের চূড়ায় রাজকীয় পতাকার পরিবর্ত্তে সাধারণ তন্ত্রের বিজয় কেতন শোভা পাইতে লাগিল।

প্যারিস বিদ্রোহের সংবাদে দেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ লুই অতি সহজে জন সাধারণের প্রাধান্য স্বীকার করায় সাময়িক ভাবে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। রাজকর্ম্মচারীদের একাধিপত্য

বিলুপ্ত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের আধিপত্য স্থাপিত হইল। রাজার প্রহরীদের দূর করিয়া সমস্ত জাতীয় দল হইতে প্রহরী নিযুক্ত হইল। ৪ঠা আগষ্ট এক ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে জন সাধারণের স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ও বিশদভাবে লিখিত হইল। ইহার দ্বারা সর্ব্ববিধরাজকার্য্যে, সমাজ বিষয়ে ও ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণের সহিত রাজবংশীয়, অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের উচ্চনীচ ভেদ দূর করা হইল। এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির মত লইয়া রাজকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। পদচ্যুত নেকার পুনরায় মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইলেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে রাজা-প্রজার এই মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। সকলেই দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে আশা করিয়াছিল। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধে বিদ্রোহ শান্ত হইতে না হইতেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, কিন্তু তখন রাজ কোষ শূন্য। সুতরাং যাঁহারা রাজ কার্য্যের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অর্থাভাবে প্রজা সাধারণের ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। ক্ষুধার জ্বালায় উন্মত্ত নরনারী প্যারিস হইতে দলে দলে ভার্সেলিস অভিমুখে চলিল। ষোড়শ লুই তখন স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ ভার্সেলিস নগরে সুখ-শয়নে নিদ্রিত ছিলেন। ক্ষিপ্ত জনসাধারণ ভার্সেলিসে পৌঁছিয়া রাজ প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া দারুণ কোলাহল আরম্ভ করিল। অনেকে মন্ত্রণাসভাগৃহে প্রবেশ করিল। রক্ষি সৈন্যদল জন সাধারণকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিল। ফলে জন সাধারণ ক্রোধান্ধ হইয়া দুইজন রক্ষীর মস্তক ছেদন করিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বেগতিক দেখিয়া রাজ সেনাপতি ল্যাফেট

রক্ষিসৈন্যদল সমভিব্যাহারে আসিয়া জনতাকে বাধা প্রদান করিলেন। বাধা পাইয়া জনসাধারাণ চীৎকার করিতে লাগিল "রাজাকে প্যারিসে লইয়া যাইব।" ক্ষুধার্ত্ত জন-সাধারণ মনে করিয়াছিল যে রাজাকে প্যারিসে লইয়া যাইতে পারিলেই রাজা প্রজার দুরবস্থা সন্দর্শনে প্রতীকার করিতে বাধ্য হইবেন। অবশেষে যোড়শ লুই বাধ্য হইয়া প্যারিসে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

যোড়শ লুই প্যারিসে আসিয়া রাজ প্রাসাদে স্থান পাইলেন বটে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার রাজ কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। প্রকারান্তরে রাজা নজর-বন্দী হইলেন। এই সময় 'মিরাবো' জাতীয় সভার সভাপতি পদে বরিত হইলেন। তখনও রাজার প্রতি কেহ অসম্মান দেখায় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ সৈন্যদলের মধ্যে রাজ-বিদ্বেষ প্রকট হইতে লাগিল। যোড়শ লুই অবস্থা সঙ্গীন বুঝিতে পারিয়া ছদ্মবেশে সপরিবারে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাতীয় দলের সৈন্যরা সপরিবারে রাজাকে ধরিয়া ফেলিল। এবারও রাজাকে পূর্ব্বোক্ত রাজ-প্রাসাদে রাখা হইল কিন্তু কড়া পাহাড়া নিযুক্ত হইল।

এদিকে দেশময় রাষ্ট্র হইল বুরণসউকের ডিউক সসৈন্যে প্যারিস আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে জন সাধারণ উন্মত্ত হইয়া রাজার দলের যাহারা বন্দী ছিল তাহাদের নৃশংসভাবে হত্যা করিল। রাজা ষোড়শ লুইএর বিরুদ্ধে জন সাধারণ ষড়যন্ত্রের মামলা করিল।

প্যারিসে আসিয়া, প্রথম প্রথম রাজা ষোড়শ লুই শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কিছু অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন তাঁহার

অধিকার হ্রাস পাইতে লাগিল। সাধারণ-তন্ত্রের নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হওয়ায় পদে পদে রাজা অপদস্থ হইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য শক্তির সহিত ষোড়শ লুইএর ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

রাজরাণী মেরিয়ো-এন্টিওনেট ছিলেন অষ্ট্রিয়া রাজার কন্যা। তিনি ফরাসী জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তিনি রাজার ষড়যন্ত্রের ইন্ধন যোগাইতে ছিলেন।

রাজার ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িলে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা সভা রাজার শেষ ক্ষমতাটুকু এমন কি রাজা উপাধিটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল। প্রকাশ্যে আদালতে রাজা ষোড়শ লুইএর ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ হইল। এবং ১৭৯২ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর ফরাসীদেশের প্রথম সাধারণ-তন্ত্র ঘোষিত হইল।

সাধারণ তন্ত্রের আদালতের বিচারে রাজা ষোড়শ লুই এর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী প্রজারা রাজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। ১৬ই অক্টোবর রাণীকেও প্রজারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। রাজা রাণীর সমাধির উপর ফরাসী দেশের প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্র সাধন করিতে গিয়া ফরাসী দেশে বিপ্লব আসিয়াছিল। আর এই মন্ত্র প্রভাবেই দেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফরাসী দেশে তিন তিনবার সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানের ফরাসী দেশ তৃতীয় বারের

ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র।

সাধারণ-তন্ত্র শাসন প্রণালী ক্রমেই পরিচালিত হইতেছে। এই যে বার বার শাসন যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ইহার গোড়ায় রহিয়াছে মূলমন্ত্রের অপব্যবহার।

বিপ্লবের সময় সকল দেশেই রাজার দলে ও প্রজার দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ফরাসী দেশে প্রজার দলের মধ্যেও 'জিরোণ্ডিষ্ট', 'জ্যাকেবিন', 'এনসাইক্লোপিডিষ্ট', 'ভ্যাণ্টনিষ্ট', 'হারবার্টনিষ্ট' ইত্যাদি অনেক দল সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক দলই প্রাণপণ চেষ্টায় দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গেইত আধিপত্য লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। এই মনোমালিন্যের ফলে দেশে নূতন শাসন যন্ত্র অধিক দিন স্থোয়ী হই- পারিল না। যে দল যখন রাজ্যের শাসন যন্ত্র হস্তগত করে সে তখন অন্যান্য দলকে দলিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই সাধারণ তন্ত্রের মূল মন্ত্র 'সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা' ভিত্তি হীন হইয়া পড়িল। দেশে অরাজকতা ও অত্যাচার পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল।

সাধারণ-তন্ত্র দলের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে রাজার দল পুনরায় নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজার দল ষোড়শ লুইএর ভ্রাতাকে অষ্টাদশ লুই নামে অভিহিত করিয়া ফরাসী দেশের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জও অষ্টাদশ লুইকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। ঠিক এই সময়ে আবার ইংরাজ ও অষ্ট্রিয়া ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। চারিদিক হইতে ফরাসী দেশে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

এই বিভীষিকাময় ফরাসী বিপ্লবের মধ্যেও একটি ক্ষীণজীবি বাঙালীর

কৃতিত্বের কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পঞ্চদশ লুইএর উপপত্নী "ম্যাডাম ডুমারি" একজন ইংরাজ জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে এক দশম বর্ষীয় বাঙালী বালককে ক্রয় করেন। পরে ক্রীতদাস বাঙালী বালক 'ডুমারির' স্নেহ যত্নে উপযুক্ত শিক্ষিত হ'ন। 'ডুমারি' এই বাঙালী বালককে জামুর বলিয়া ডাকিতেন। জামর রুঁসোর প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার' ভাবে ভাবুক হইয়া পড়েন। এবং ফরাসী বিপ্লবে যোগ দেন। ভবিষ্যতে এই বাঙালী ক্রীতদাস সম্পুর্ণ স্বাবলম্বী ভাবে ফরাসীদেশের একটি সভার সম্পাদক এবং অপর একটি কার্য্যকরী সভার সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলেন। বিদেশে এক অসহায় বাঙালীর এই কৃতিত্ব বাঙালী জাতির গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ফরাসী বিপ্লবে বাঙালী

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে নেপোলিয়েনের ব্যক্তিত্ব ও অসীম ক্ষমতা প্রায় সবখানি জুড়িয়া আছে। এমন কি ইউরোপের ইতিহাসে ও গত মহাযুদ্ধের নায়ক জার্ম্মান সম্রাট কাইজার ব্যতীত নেপোলিয়নের তুল্য দুর্দ্দমনীয় বীর আর দৃষ্ট হয় না।

নেপোলিয়েন বোনোপার্টি

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কর্ষিকা দ্বীপে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মিবার দুইমাস পূর্ব্বে কর্ষিকা দ্বীপ ইতালির হস্ত হইতে ফরাসী অধিকারে আসে। সুতরাং তিনি কয়েকমাস পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে ইতালির অধিবাসীরূপে গণ্য হইতেন। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য চক্রের পরিবর্ত্তনে ফরাসী অধিবাসীরূপে পরিগণিত হইলেন।

সংসারের অতি দুর্দ্দিনে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। নেপোলিয়নের

পিতার নাম চার্লস বোনাপার্ট, মাতার নাম লেঠিশিয়া বেমেলিনী। চার্লিস বোনাপার্ট আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। কর্ষিকা দ্বীপ যখন ফরাসীর অধিকারভুক্ত হয় তখন নেপোলিয়েন বোনাপার্টির পিতা স্বদেশ ভক্ত প্যাওলিদের সহিত মিলিত হইয়া ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন; কিন্তু বারংবার পরাজিত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য পার্ব্বত্য গভীর অরণ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হ'ন। সংসারের অনাটন উপস্থিত হইল। পরিবারের মধ্যে এই আর্থিক অনাটনের দরুণ নেপোলিয়ন বাল্যজীবনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের বয়স যখন মাত্র যোল বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। নেপোলিয়নের মাতা আটটি শিশু সন্তান লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে নেপোলিয়নের মাতা তাঁহার যৎসামান্য সম্পত্তি সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফরাসীদেশে আসিয়া বসবাস করিতে বাধ্য হ'ন।

নেপোলিয়নের ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্খা বাল্যকালেই তাঁহার মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষা হইতে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা গ্রীস রোমীয় বীর গণের অত্যদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী গল্পচ্ছলে প্রায়ই শিশু পুত্রকে শোনাইতেন। নেপোলিয়নের তরুণ হৃদয়ে বীরত্বের মাদকতা শৈশব হইতেই দেখা গিয়াছিল। তিনি বরফের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সমবয়সী সাথীদের সহিত যুদ্ধের খেলা খেলিতেন। এই যুদ্ধ পিপাসু উচ্চাকাঙ্খী বালকের অতুল বীরত্বে পরবর্ত্তী কালে সমগ্র ইউরোপ ভীত, ত্রস্ত হইয়াছিল।

হৃদয়ে দারুণ ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের প্রায়ই অভাব হয় না॥ পথের বাধা-বিঘ্ন বন্যার স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যায়। নানাবিধ অসুবিধা ও অনটনের মধ্যে যখন নেপোলিয়নের শৈশব বৃথাই নষ্ট হইতেছিল।

তখন কাউণ্ট মারবোফ নামক জনৈক ভদ্রলোক কর্সিকার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। বালকের তীক্ষ্ণ মেধা ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তিনি নেপোলিয়নের পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নেপোলিয়নের বয়স যখন দশ বৎসর তখন মারবোফের কৃপায় বালক 'যুদ্ধ বিদ্যালয়ে' প্রবেশ করিলেন। পরে পঞ্চদশ বয়ঃক্রম কালে প্যারিসের 'রয়েল মিলিটারী' স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তথায় বৎসরাবধি উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া গোলন্দাজ সৈন্যের সহকারী লেফ্‌টেনেণ্ট পদ প্রাপ্ত হ'ন।

পূর্ব্বাপর সাধারণ-তন্ত্রের সহিত নেপোলিয়নের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। কাজেই তিনি লেফ্‌টেনাণ্ট হইয়াই সাধারণ-তন্ত্রের শত্রু ধ্বংসের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিপ্লবের যুগে ফরাসী দেশ অরাজকতার ক্রীড়াভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল। বৈদেশিক রাজার সৈন্যেরা আসিয়া দেশের মধ্যে নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল। নেপোলিয়ন এই অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তাঁহার এই কৃতকার্য্যতায় পদোন্নতি ঘটে। তিনি সহকারী লেফ্‌টেনেণ্ট হইতে কাপ্তেন পদে উন্নীত হ'ন।

ফরাসী রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ বুঝিয়া ইংরাজ ফরাসী রাজ্যের অন্তর্গত টুঁলো নামক এক সমুদ্র-বন্দর অধিকার করেন এবং প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করিয়া রাখেন। নেপোলিয়ন মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্যের সহায়ে ইংরাজকে পরাজিত করিয়া অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং টুলোঁ অধিকার করেন। এই সময় কর্সিকা দ্বীপ ফরাসীদের হস্তচ্যুত হয়। নেপোলিয়ন এই দ্বীপটীও ইংরাজের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করেন।

তাঁহার উপর্য্যুপরি এই বিচক্ষণতা ও যুদ্ধ-নৈপুণ্যে দেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল পদে অভিষিক্ত করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আল্প্‌স্‌ প্রদেশীয় সৈন্য চালনার ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি আল্পস পর্ব্বতে গমন করেন এবং তাঁহার অলৌকিক যুদ্ধ কৌশলে আল্পস প্রদেশেও ফরাসীর অধিকার স্থাপন করিলেন। কিন্তু মানুষ মানুষের উন্নতি দেখিতে পারে না। নেপোলিয়নের এই উন্নতি ও বর্দ্ধমান খ্যাতিতে কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে অনেকে হিংসা করিতে লাগিলেন। কাজেই চারিদিকে শত্রু গড়িয়া উঠিল এবং দেশ-দ্রোহিতার অভিযোগে নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন। কয়েকদিন পরে তিনি মুক্তি পাইলেন বটে কিন্তু পদাতিক সৈন্যদলের এক অধঃস্তন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।—জেনারেল পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। বীর-হৃদয় এই অপমান সহ্য করিতে পারিল না। সংসারের দারুণ অনটনের দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া অবলীলাক্রমে চাকরী ত্যাগ করিলেন। কয়েকদিন দুই বেলা পেট ভরিয়া সপরিবারে আহার করার পরই আবার অন্নকষ্ট প্রবল ভাবে দেখা দিল। অন্নকষ্টে উন্মাদ-প্রায় হইয়া নেপোলিয়ন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেই সময় তাঁহার জনৈক বন্ধু আসিয়া ছয় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া সমস্ত অভাব বিমোচন করেন। সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নও নিজের দৌর্ব্বল্য সবলে ছিন্ন করিয়া অসীম উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যাহারা জগতে মহৎ কর্ম্মভার লইয়া জন্মেন তাঁহাদের জীবন নানা ঘটনা-পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া এমনি ভাবেই রক্ষা পায়। সেদিন নেপোলিয়ন যদি আত্মহত্যা করিতেন তবে আজ জগতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। তিনি ভবিষ্যতে সম্রাট হইয়াও এই অকৃত্রিম

বন্ধু ডেমাসিস্‌কে বিস্মৃত হ'ন নাই। ডেমাসিস্‌ বৃদ্ধ বয়সে যখন কৃষিকার্য্যে জীবনাতিপাত করিতেছিলেন তখন হঠাৎ একদিন নেপোলিয়ন সেখানে উপস্থিত হইয়া ডেমাসিস্‌কে অনেক পীড়াপীড়ির পর ছয় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। মহৎ হৃদয় ডেমাসিস্‌ ওই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। নিজের জন্য এক পয়সাও ব্যয় করেন নাই।

অকস্মাৎ নেপোলিয়নের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। রাজপথে শান্তি-রক্ষার জন্য একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির একান্ত আবশ্যক হইল। কাজেই নেপোলিয়নের আবার ডাক পড়িল। তৎকালে ফরাসী রাজ্যে নেপোলিয়নের অপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল না। তিনি ভূবৃত্তান্ত জ্ঞাপক সমিতির সভাপতি পদে বরিত হইলেন। তাঁহার দেশের ভূপরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান অসামান্য ছিল। আশৈশব তিনি অতি যত্নের সহিত ভূগোল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং দেশের নদ-নদী গ্রাম-নগর প্রভৃতি যাবতীয় খুঁটি নাটি বিষয় পর্য্যন্ত তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

আবার ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ানদের সহিত যুদ্ধ বাধে। নেপোলিয়ন ইতালির সৈন্যভার প্রাপ্ত হইয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইতালীতে অষ্ট্রীয় সেনাপতির সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও ভাগ্যলক্ষ্মী নেপোলিয়নেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। পর বৎসর অষ্ট্রীয় সেনাপতি বাধ্য হইয়া নেপোলিয়নের সহিত এক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিতে ফরাসী-রাজ্য বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিল। সমগ্র ইউরোপ নেপোলিয়নের এই বিজয় বার্ত্তায় বিস্মিত হইল। তাঁহার অত্যদ্ভুত জয়ের পর জয়ের কাহিনী ও অসীম সাহসিকতায় অনেকে তাঁহাকে দৈববলে বলীয়ান মনে করিতে লাগিল এবং দলে দলে তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইয়া নেপোলিয়নের শক্তি বৃদ্ধি

করিতে লাগিল। কিন্তু এই সকল জয়ের মূলে ছিল তাঁহার কর্ম্মঠতা ও অধীনস্থ কর্ম্মচারী বৃন্দের ও সৈন্যদলের হৃদয় জয় করিবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা।

নেপোলিয়ন নিদ্রা বা বিশ্রাম যেন জানিতেনই না। এই কর্ম্মপ্রাণ বীর-সাধক দিবারাত্র কর্ম্মের মধ্যে নিজেকেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং কর্ম্মই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি কখনও দুই তিন ঘণ্টার বেশী কোন দিন ঘুমাইতেন না। ইহা ছাড়াও তাঁহার চরিত্রের মধ্যে আর একটি মহৎ গুণ বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পরকে আপন করিতে হইলে যে স্বার্থত্যাগ, যে সহানুভূতি প্রয়োজন, নেপোলিয়ন তাহা বিশেষ জানিতেন। আর সেই গুণেই তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্যের হৃদয় দেবতার আসন পাইয়াছিলেন। তিনি ইতালী জয় করিয়া যে অমূল্য ধন রত্ন পাইয়াছিলেন তাহা তিনি নিজে না লইয়া সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং যাহার যাহা অভাব তাহা বিমোচন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের আবার এই দিগন্তব্যাপী যশঃপ্রভায় ফরাসী দেশের উচ্চতন কর্ম্মচারীরা ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। এই বিজয়ের পর বিজয়ে নেপোলিয়নের বিজয়োৎফুল্ল হৃদয়ও নূতন দেশ জয়ের আশায় মাতিয়া উঠিল। তিনি মিশর জয়ের অনুমতি চাহিলেন। ডিরেক্টর সভাস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে দূরে রাখিবার অভিলাষে মিশর অভিযানে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু এখানেও ভাগ্যদেবী নেপোলিয়নের প্রতি প্রসন্ন হইল। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া সহর অধিকার করিয়া সম্পূর্ণরূপে কাইরোর অধিপতি হইলেন। কিন্তু মানুষের আশার শেষ নাই। মানুষ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে চায় না। অন্তরাত্মা হাঁকিতেছে—আরও চাই, আরও চাই। এই

অতৃপ্ত বাসনা লইয়া সে ছুটিয়াছে কোন্ অসীমের পানে। নেপোলিয়ন মিশর জয় করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সিরিয়ার পথে কনস্তান্তিনোপল এবং পরিশেষে ভারতবর্ষ জয় করিতে সংকল্প করিলেন। এই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি টিপু সুলতানের সহিত পত্র আদান প্রদান পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন্ তাঁহার আশার পথে কণ্টক স্বরূপ হইলেন। নেপোলিয়নের ইংরাজকে তাড়াইয়া ভারতে ফরাসী-অধিকার স্থাপনের আশা চিরতরে লুপ্ত হইল।

নেপোলিয়ন যখন প্রাচ্য জয়ের অলীক কুহকে মত্ত ছিলেন তখন তাঁহার নিজের গৃহ ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জ কর্ত্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছিল। নেপোলিয়ন এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নব অধিকৃত মিশর রাজ্যের ভার একজন সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিয়া দেশে ফিরিলেন। দেশে তখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তৎকালীন প্রবর্ত্তিত 'ডিরেক্টর' সভার উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক 'কনসলেট' সভা গঠন করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নোপোলিয়নকে এই সভার পরিচালক বা 'কনসাল' পদে অভিষিক্ত করিলেন।

'কনসাল' হইয়াও নেপোলিয়নের ভাগ্যে বিশ্রাম জুটিল না। আবার অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু পূর্ব্ববৎ এবারেও অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি নেপোলিয়নের নিকট বারংবার পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ১৮০১ খৃঃ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ফরাসীতে এক সন্ধি হইয়া গেল। তৎপরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ নেপোলিয়নকে মহাসমারোহে ফরাসী রাজ্যের সম্রাট পদে বরণ করিল।

আমাদের বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, "পত্নী ভাগ্যে ধন"। এই প্রবাদটা বীর-পুঙ্গব নেপোলিয়নের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য।

দাম্পত্য জীবন

নেপোলিয়নের সহধর্ম্মিণীর নাম জোসেফিন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন জোসেফিনের পাণিগ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের বিবাহ কিছু আশ্চর্য্য ধরণের। বিবাহের সময় নেপোলিয়নের বয়স চব্বিশ এবং তাঁহার নব পরিণীতা স্ত্রীর বয়স তখন তেত্রিশ। তদুপরি পূর্ব্বপক্ষের দুইটি সন্তান বিদ্যমান ছিল। জোসেফিনের বয়স যখন পনর তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পরে তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষের স্বামী 'ভাই-কাউণ্ট ডি বেহারনেস' রাজদ্রোহিতা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জোসেফিন বন্দী হ'ন। বন্দিনী জোসেফিনের রূপে মুগ্ধ হইয়া নেপোলিয়ন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

জোসেফিন তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মীরূপে আসিয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতে তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল এবং দিনের পর দিন তাঁহার পদোন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ফরাসী সম্রাজ্যের সম্রাট পর্য্যন্ত হইলেন। যতদিন জোসেফিন পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে বিরাজমানা ছিলেন ততদিন নেপোলিয়নের ভাগ্য সম্পদ অটুট ছিল। কিন্তু মনীষিরও মতিভ্রম ঘটে। নেপোলিয়নেরও তাই ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়ন মানুষ, নেপোলিয়ন দেবতা নয়। মানুষের ভুল ভ্রান্তি কিছু বিচিত্র নয়। তের বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সম্পদ ও দাম্পত্য-প্রেমের মধুতে ভরা মহাবীর নেপোলিয়নের জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ নেপোলিয়ন জোসেফিনকে পরিত্যাগ করিলেন। জোসেফিনকে পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের ভাগ্যলক্ষ্মীও নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ

করিল। নেপোলিয়ন গত-প্রাণা সতী জোসেফিনের তপ্ত চক্ষুজলে নেপোলিয়নের গৌরব-স্থর্য্য নিস্তেজ হইয়া পড়িল! নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হইল। দলিতা অপমানিতা জোসেফিন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় মাত্র পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন। অন্তিম শয়নে 'নেপোলিয়ন! নেপোলিয়ন' বলিতে বলিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সতীর প্রাণে ব্যথা দিয়া সতী রমণীকে অপমান করিয়া কেহ কোন দিন নিস্তার পায় নাই। সতীকে অপমান করিয়া দক্ষের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। সতী সীতার চোখের জলে কণকপুরী লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল। দ্রোপদীর চোখের জলে কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছিল। সতী জোসেফিনের চোখের জলেও এই গতানুগতিক চিরন্তনী সত্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। জগতের ইতিহাসে এই সত্যের কোন দিন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। থাক্ এ সব কথা।

নেপোলিয়নের এই মতিচ্ছন্নতার দ্বিবিধ মতবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায়। একটি মত এই যে—নেপোলিয়নের ঔরসে কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায়, নিজের উত্তরাধীকারীর জন্যই তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষ বলেন—উচ্চ রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার বংশ পরাম্পরাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার দুরাশায় নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, আমাদের মনে রাখিতে হইবে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ জোসেফিনকে পরিত্যাগ করার পর হইতেই নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হয় এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ এই তের বৎসর কাল তিনি আপন গৌরব ও প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তিতেই য়ূরোপের ইতিহাসে দেদীপ্যমান ছিলেন।

## স্বাধীনতার সংগ্রাম

ইউরোপের সর্ব্বত্র সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ড, স্পেন, পর্ত্তুগাল, রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানি কেহই বাদ গেল না। সে সময় ভারতেও ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয় জাতিতে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সুযোগে পৃথিবীর সম্রাট রাজচক্রবর্ত্তী হইবার নেশায় নেপোলিয়ন ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার এই রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার পথে ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুতরাং নেপোলিয়ন 'ইংলিশ চ্যানেল' অধিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ একবার 'ইংলিশ চ্যানেল' দখল করিতে পারিলে নেপোলিয়নের পক্ষে ইংলণ্ড জয় করা কিছু কঠিন হইবে না। নেপোলিয়ন উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "যদি ছয় ঘণ্টার জন্যও আমি 'ইংলিশ চ্যানেলে' অধিকার বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি পৃথিবীর সম্রাট পদ লাভ করিতে পারিব।" নেপোলিয়নের এই উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে ইংরাজ-ফরাসীতে যুদ্ধ অনিবার্য্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত এবং ইংরাজের বিজয়কেতন সগর্ব্বে উড্ডীন হইল। এই যুদ্ধই ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—'ট্রাফালগার যুদ্ধ' নামে অভিহিত। ট্রাফালগার যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হইলেন সত্য কিন্তু সেদিন যে অমূল্য রত্নের বিনিময়ে এই জয়শ্রী ক্রয় করিলেন তাহা ইংলণ্ড বাসী কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। এই ট্রাফালগার যুদ্ধে ইংরাজের জগৎ বিখ্যাত বিজয়ী নৌ-সেনাপতি নেলসন যুদ্ধের শেষ সময় এক গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইংরাজের জয়ের হর্ষে বিষাদের সুদীর্ঘ কালো ছায়া পতিত হইল।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

আধিপত্যের নেশা বড় তীব্র। ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও

নেপোলিয়ন আশা ছাড়িলেন না। দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি নূতন রাজ্য জয়ে অগ্রসর হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্টারলিজের যুদ্ধে রুশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার সমবেত শক্তিকে পরাজিত করিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌স্ জয় করিয়া নিজ ভ্রাতাকে সেখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে তাঁহার সমগ্র ইউরোপের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। এই সময় তিনি ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার জন্য 'বর্লিন ডিক্রি' নামক এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এতদ্বারা ইউরোপের অন্যান্য দেশকে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে আদেশ করিলেন। স্পেন ও পর্ত্তুগাল নেপোলিয়নের এই আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিল। স্পেন ও পর্ত্তুগালের এই ধৃষ্ট ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া নেপোলিয়ান উক্ত দেশদ্বয় বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। স্পেন ও পর্ত্তুগালের রাজা প্রাণভয়ে ব্রাজিল দেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দেশবাসী নেপোলিয়নের এই ব্যবহার সহ্য করিল না। সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ 'পেনিনসুলার' যুদ্ধ নামে খ্যাত।

ইংরাজ বণিকের জাতি। কাজেই অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় ইংরাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর নেপোলিয়নের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী নেলসন নাই। কি উপায়ে নেপলিয়নের বর্দ্ধমান শক্তিকে দমন করা যায় সেই চিন্তায় ইংরাজ পাগল হইয়া উঠিল। সে সময়ে রব উঠিল নেপোলিয়ন ভারতবর্ষ জয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইংরাজ আর স্থির থাকে কি করিয়া? এই সময় স্পেনে পেনিনসুলার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজ এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভারতে

মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধ-ব্যাপৃত মহাযোদ্ধা ইংরাজ-সেনাপতি স্যার আর্থার ওয়েলেশ্‌লি স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য ইংলণ্ডে আহূত হইলেন এবং 'পেনিনসুলার' যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের সাহায্য করিবার জন্য স্পেনে প্রেরিত হইলেন।

স্পেনীয়রাও ইংরাজ-শক্তির সহায় পাইয়া প্রবলবেগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। ছয় বৎসর কাল যুদ্ধ চলিল। বহু ফরাসী সৈন্য নিহত হইল। ইংরাজ-সেনাপতি বহু যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজিত করিলেন। অবশেষে ছয় বৎসর যুদ্ধের পর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের প্রথম সন্ধি হইয়া যুদ্ধের অবসান হয়। শক্তিমদে মত্ত হইয়া মানুষ যে অন্ধ হয় নেপোলিয়ন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। 'পেনিনসুলার' যুদ্ধে যখন ইংরাজ-স্পেনীয়দের সমবেত শক্তির সহিত ফরাসী জাতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ব্যাপৃত তখনও নেপোলিয়ন নবীন আশা কুহকে মুগ্ধ হইয়া নূতন রাজ্য জয়ের পিপাসায় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুষ অভিযানে বহির্গত হইলেন। এই রুশ অভিযানই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেপোলিয়নের জীবনের মারাত্মক ভ্রম।

অভিযানের প্রথমেই তিনি 'বারোভিনোর' যুদ্ধে জয়লাভ করায় সোৎসাহে মস্কো সহরে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহরবাসী বেগতিক দেখিয়া সহর অগ্নিসংযোগে সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ করিয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। নেপোলিয়ন মস্কোতে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমেত উপস্থিত হইয়া মহাসমস্যায় পড়িলেন। সঙ্গে চারি লক্ষ সৈন্য, কিন্তু খাদ্য নাই। এদিকে শীতও আরম্ভ হইল। দারুণ শীতে, অনাহারে দলে দলে সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। কাজেই নিরুপায় হইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে রুষসৈন্য

পশ্চাৎ দিক হইতে এবং উভয় পার্শ্ব হইতে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়ার সৈন্য আক্রমণ করিল। নেপোলিয়ন মহা ফাঁপড়ে পড়িলেন। তথাপি এই অসুবিধার মধ্যেও তিনি অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে 'লিপজিগে' রুষিয়া, প্রুসিয়া ও সুইডেনের সমবেত শক্তির নিকট তিন দিন বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া নেপোলিয়ন রণে ভঙ্গ দিয়া প্যারিসে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। এই রুষ-অভিযানে তাঁহার অত্যন্ত শক্তি-ক্ষয় হইয়াছিল। তিনি চার লক্ষ সৈন্যসহ যাত্রা করিয়াছিলেন, মাত্র বিশ সহস্র সৈন্যসহ প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন।

এদিকে তখন 'পেনিনসুলার' যুদ্ধেও ফরাসীদের পরাজয় হইয়াছে। এই ভাবে উভয়দিক হইতে যুগপৎ পরাজিত হইয়া নেপোলিয়ন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক হইতে জয়োন্মত্ত সমবেত শক্তিপুঞ্জ প্যারিসে প্রবেশ করিয়া নেপোলিয়নকে বন্দী করিল। অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এলবা'-দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার মোহের স্বপন এইখানেই ভাঙ্গিয়া গেল।

নেপোলিয়ন নির্ব্বাসিত হইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের শক্তি-পুঞ্জের সহিত ফরাসীর সন্ধি হইল। এই সন্ধিই 'প্যারিসের প্রথম সন্ধি' নামে অভিহিত। এই সন্ধি অনুসারে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ অষ্টাদশ লুইকে ফরাসী রাজ্যের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত শক্তি শক্তি-পুঞ্জের হস্তেই রহিয়া গেল। অষ্টাদশ লুই নামে মাত্র রাজা হইয়া শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়াপুত্তলি হইলেন। ফরাসী দেশে বিদেশীর আধিপত্য বিস্তৃত হইল। সাধারণ-তন্ত্রের সকল আশা সমূলে উৎপাটিত হইল। বিদেশীর অত্যাচারে দেশ প্লাবিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়নবিহীনে

দেশবাসী জীবনী-শক্তি হারাইয়াছিল। কাজেই বিদেশী শক্তিপুঞ্জের আধিপত্যে ও রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের ব্যবহারে তাহারা মনের জ্বালা মনেই মিটাইতে লাগিল। কোনরূপ বাধা দিতে পারিল না। নেপোলিয়নের সহকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ও আত্মীয় স্বজন বিনা বিচারে দণ্ড পাইতে লাগিল। নেপল্‌সের রাজা নেপোলিয়নের ভ্রাতা মুরাট বাধা দিবার চেষ্টা করায় তাঁহারও প্রাণ দণ্ড হইল। দেশময় অবসাদের চিত্রক্লান্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

যাঁহারা জীবনে মহাকর্ম্মভার লইয়া জন্মেন তাঁহারা শত বিপদেও কোন দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন না। নেপোলিয়ন বন্দী হইয়াও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। প্রজাসাধারণের ব্যথায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। কি করিয়া আবার ফরাসী দেশে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন করা যায় সেই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পলায়নের জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ সদয় ও অনুকম্পাসূচক ব্যবহারে 'এলবা'-দ্বীপের স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন ও উচ্চ-নীচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। সুতরাং সমস্ত এলবা-বাসী তাঁহার পলায়নের সঙ্কল্পে প্রাণপণ সাহায্য করিতে লাগিল।

এলবা-দ্বীপে নেপোলিয়ন যখন পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার ভগিনী পোলিন ফরাসীদেশে বুরবোঁ রাজ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া নেপোলিয়নের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। এই প্রচারের ফলে প্রজা-সাধারণের মনে নেপোলিয়নের প্রতি যখন সহানুভূতি প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন পোলিন এলবা-দ্বীপে নেপোলিয়নকে এই সংবাদ পাঠাইলেন। এই শুভ সংবাদে

উৎসাহিত হইয়া অনতিবিলম্বে নেপোলিয়ন এলবা-দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া অতি গোপনে ফরাসী দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে দলে দলে লোক তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইতে লাগিল। তিনিও ক্রমশঃ প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়নের আগমন সংবাদে তাঁহার গতিরোধ করিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যদল নেপোলিয়নের সম্মুখীন হইয়াই নেপোলিয়নকে চিনিতে পারিয়া বিনা যুদ্ধে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। চারিদিকে নেপোলিয়নের আগমন সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলের পর দল স্বেচ্ছায় আসিয়া নেপোলিয়নের সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল। অতঃপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাজধানী প্যারিস নগরে উপনীত হইলেন। অষ্টাদশ লুই তখন বেলজিয়মে পলাইয়াছিলেন। জন-সাধারণ আবার তাঁহাকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিল। সমগ্র ইউরোপখণ্ডে কম্পিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "আবার নেপোলিয়ন!"

নেপোলিয়ন সম্রাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। নেপোলিয়নকে দমন করিবার জন্য ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রুসিয়া জার্ম্মাণী, সুইজার্লণ্ড ও রুষিয়ার সমবেত শক্তি চারি দিক হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওয়াটার্‌লু ক্ষেত্রে এক দিকে বীরপুরুষ নেপোলিয়ন ও অপর দিকে অন্যান্য শক্তির সহায়তায় শক্তিমান ইংরাজ-সেনাপতি ওয়েলিংটন। যুদ্ধের প্রথম ভাগে নেপোলিয়নের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণে ওয়েলিংটনের জয়ের সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক সেই সময়ে সেনাপতি ব্লুকার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া ওয়েলিংটনের সহিত যোগ দিলেন অথচ নেপোলিয়নের সেনাপতি গ্রোচি আসিয়া

নেপোলিয়নকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নেপোলিয়নকে এই সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হইতে হইল। তিনি পরাজিত হইয়া প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রায় সমস্ত সৈন্যদল সেদিনকার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিল। নেপোলিয়নের আশা চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

ওয়াটারলুর যুদ্ধের পরাজয়ের পর ফরাসী দেশের প্রতিনিধি-সভা সমবেত হইয়া নেপোলিয়নকে সম্রাটপদ ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিল। তখন পর্য্যন্ত যদিও বহু লোক ও সেনাপতি নেপোলিয়নকেই সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত রাখিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি নেপোলিয়ন প্রতিনিধি-সভার আদেশ অমান্য করিয়া গৃহবিবাদ সূচনার পরিবর্ত্তে সানন্দে সম্রাট পদত্যাগ করিলেন। তিনি প্রতিনিধি-সভাকে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু প্রতিনিধি-সভা তাঁহার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

সম্রাট-পদ ত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ন ফরাসী রাজ্য হইতে চিরতরে বিদায় লইতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ তাঁহাকে ধরিবার জন্য জলে স্থলে লক্ষ লক্ষ সেনা নিযুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার কোথাও থাকিবার স্থান ছিল না। অগত্যা তিনি নিজেই ইংরাজের হাতে ধরা দিলেন। ইংরাজ কিন্তু এই রাজাধিরাজ বন্দীর উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাকে সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং যাহাতে পূর্ব্ববৎ পলাইতে না পারেন তাহার জন্য কড়া পাহারা নিযুক্ত করা হয়। এই নির্ব্বাসিত অবস্থায় ফরাসী জাতির গৌরব-রবি জগতের পূজ্য মহাবীর একটুকরা রুটীর অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় কতই না কষ্ট

পাইয়াছেন। নেপোলিয়নের ভাগ্যে ইহার অধিক আর কি হইতে পারে! অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় এই বন্দী অবস্থায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অন্ত্রক্ষত রোগে এই মহাবীরের প্রাণ-বিয়োগ হয়।

নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বার সম্রাট পদচ্যুত হইলে অষ্টাদশ লুই পুনরায় ফরাসী রাজ্যের সম্রটপদে অভিষিক্ত হইলেন। অষ্টাদশ লুই-এর রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে ফরাসী দেশে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল এবং নেপোলিয়ন বিহীন ফরাসীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য বহুবিধ অন্যায় দাবী পূরণ করিতে বাধ্য করিল। আর এই দাবী পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকরী করিবার মানসে ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি 'হোলি এলায়েন্স' বা 'পবিত্র সম্মিলনী' নামে অভিহিত। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ লুই রাজত্ব করেন। তাঁহার পর দশম চার্লস্ রাজা হ'ন।

দশম চার্লস্ রাজা হইয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ, 'চেম্বার অফ্ ডেপুটী' বা প্রতিনিধি সভার পরিবর্ত্তন সাধন এবং নূতন নির্ব্বাচন-প্রথার সৃষ্টি করিয়া নিজের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিবার মানসে মন্ত্রণা-সভায় অধিক সংখ্যক রাজকীয় সদস্য গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাবহারে, দেশবাসী ও প্রতিনিধি-সভার সহিত মনোমালিন্য ঘটে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিন দিন ব্যাপীয়া ফরাসী রাজ্যে এক নূতন বিপ্লব উপস্থিত হয়। দশম চার্লস্ রাজপদ ত্যাগ করেন। প্রজা অসন্তুষ্ট হইলে রাজার রাজত্ব কখনও টিকিতে পারে না।

দশম চার্লস্ সিংহাসনচ্যুত হইলে জনসাধারণ লুই ফিলিপকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৮৩০ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ এই কয় বৎসর কাল ফিলিপের রাজত্বকাল। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর জনসাধারণের মতের

অনুকূলে মত দিয়া তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন ; কিন্তু শীঘ্রই দেশের মধ্যে টিয়ার্সের দল ও গুইজটের দল নামক দুইটি দলের আবির্ভাব হইল। দেশে দলাদলি আরম্ভ হইল। ক্রমে দলাদলি হইতে রক্তারক্তি আরম্ভ হইল। ফিলিপ প্রাণভয়ে ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর দেশে আবার সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ফরাসী রাজ্যে ইহাই দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্র নামে অভিহিত।

১৭৯২ খৃঃ হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'কন্সলেট্'-সভার অধীনে দেশের রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এই সময় হইতেই নেপোলিয়নের প্রাধান্য কাল। অবশেষে প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং নেপোলিয়ন সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হ'ন। পুনরায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যথারীতি আপন মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। এই সময় নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হ'ন। এই সময় প্রেসিডেণ্টের সময় কাল নিরূপিত ছিল চার বৎসর। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। তদবধি দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্রের সমাপ্তি। ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ইতালীর স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দিনেমারগণের যুদ্ধ ও ফরাসী-প্রুসিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ফরাসী-প্রুসিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ন বহু সৈন্য সমেত প্রুসিয়ার সেনাপতির হস্তে বন্দী হ'ন এবং ফরাসী ও প্রুসিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাধারণ-

তন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই তৃতীয় সাধারণ-তন্ত্র নামে অভিহিত এবং এই তৃতীয় সাধারণ-তন্ত্রই আজ পর্য্যন্ত ফরাসী দেশে প্রচলিত আছে।

## ইতালীর পুনরুত্থান

দেশ নিজের দোষেই স্বাধীনতা হারায় আবার নিজের বাহু বলেই তাহার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। কোন দেশই স্বাধীনতা ও উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া চিরকাল শক্তিগর্ব্বে গ্রীবাত্তোলন পূর্ব্বক সময়ের গতির নিয়মকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারে না। উন্নতির পর পতন আবার উন্নতি, গতির ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, ইতালীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ছিল; ইউরোপীয় জাতি বর্গে যখন বন্য পশুর অপেক্ষা কোনগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল না; তখন এই ইতালীর রোম সাম্রাজ্য সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় আলোকে সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়াছিল। সে আজ বহুদিনের কথা। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সেই সুদূর অতীতের গাঢ়তমিশ্র ভেদ করিয়া পথ চিনিতে না পারিতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তাহার বক্ষে মৃত্যুহিম ছাপ বহন করিয়া সত্যকে অমলিন রাখিতে ত্রুটি করে নাই। ইতালির বিশ্বব্যাপি সভ্যতা, তাহার পতন আবার উত্থান সমস্তই ইতিহাসের বক্ষে সমভাবে স্থান পাইয়াছে।

ইতালীর পুনরুত্থানের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরা ভারত সভ্যতার কথা মনে আসাই স্বাভাবিক, ইতালী যাহা হারাইয়াছিল তাহা আবার ফিরিয়া পাইয়াছে কিন্তু ভারত যাহা হারাইয়াছে

আজ ও তাহা ফিরিয়া পায় নাই। সে আজও পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। কিন্তু ইতালীর ইতিহাসের পর্য্যায় পরীক্ষা করিয়া ইহা বেশ জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, ভারতের ও অচিরে বহুযুগের দৈন্য আবর্জ্জনা পরাধীনতা মুক্ত হইয়া পুনরুত্থানের দিন আসিবে।

চিরকালই রোম ইতালীর রাজধানী এবং রাজধানী রোমের নামানুসারেই রোম সাম্রাজ্য বা রোম সভ্যতা নামকরণ হইয়াছে। রোম সভ্যতার সহিত ভারত সভ্যতার যে বিশিষ্ট যোগাযোগ ছিল ইহা অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ পোবাকের মতে 'রাম' শব্দ হইতেই রোম নামের উৎপত্তি। তিনি বলেন—"ইংরাজী 'এ' ('a') বর্ণের পরিবর্ত্তে 'ও' ('o') বর্ণের প্রয়োগ অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'রোম' শব্দটি লাটিন ভাষার শব্দ নহে। ভারতবর্ষ হইতে উপনিবেশিকগণ আসিয়া রোমরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং সেকালে হিন্দুদিগের বীরগণ, প্রাচীন গ্রীসের এবং রোমের দেব দেবী বলিয়া পূজিত হইতেন। ইত্যাদি।" যাহাই হোক্ এখানে এ সব আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই পুস্তকে রোম সভ্যতা সম্বন্ধে বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই আমার বক্তব্য কেবলমাত্র ইতালীর পুনরুদ্ধারের ইতিহাস গণ্ডীবদ্ধ করা।

রোম সাম্রাজ্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অতুলনীয় সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালী দেশ বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে রোমের উভয় পার্শ্বে দক্ষিণে ও বামে দুইটি নূতন ধর্ম্ম দিনের পর দিন শক্তি সম্পন্ন বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিকে খৃষ্ট ধর্ম্ম অপরদিকে মুহম্মদের আবির্ভাব। খৃষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাবের ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী,

পতনের চরম অবস্থা

জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়া আসিয়া ইতালীর বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে অনায়াসে করতলগত করিয়া বসিল। ওদিকে মহম্মদের অনুচরবর্গ নবজাগ্রত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তুকিস্থান রোমসাম্রাজ্য হইতে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইল। ফলে অবশিষ্ট ভূখণ্ড হস্তপদহীন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির অন্তর্ভূক্ত হইল।

এই সময় ইতালী দেশ রোম, টাস্কালী, লম্বার্ডি, পিডমণ্ট, ভিনিসিয়া, নেপথস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অংশে এক একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই অষ্ট্রীয়া সম্রাটের অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিলেন।

শাসন পদ্ধতি—

এই শাসনকর্ত্তাদের বা দেশের জনসাধারণের কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের 'পবিত্র সম্মিলন' বা Holy allianceএর পর হইতে ইতালির পরাধীনতা শৃঙ্খল আরও দৃঢ় হয়। কারণ নেপোলিয়নের পতনের ঠিক পরেই ইউরোপের রাজন্যবর্গ নিজেদের রাজ্য রক্ষার্থে এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে নিরঙ্কুশ রাজ্য সম্পদ ভোগ করিবার আশায় পরস্পরের মধ্যে এই সন্ধির দ্বারা একতা বদ্ধ হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

ইতালির রাজনীতিক অবস্থা যখন এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ঠিক সেই সময়ে ধর্ম্মযাজকদের অত্যাচারও দেশে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। এইভাবে উভয়দিক হইতে নিষ্পিষ্ট হইয়া উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আশা, উচ্চ কল্পনা প্রভৃতি মানব হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি ইতালি হইতে একেবারে লোপ পাইল। ইতালির এই ঘোর অশান্তির ছবি "গারি বল্ডীর জীবন চরিতে" এই ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে—"ইতালী, ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ, ছয়টি যথেচ্ছাচারিণী প্রভূশক্তি দ্বারা খণ্ড বিভক্ত পতিত পোপীয় শাসনের অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায়

দাসীকৃত এবং নিজের রাজগণের এবং প্রভুভক্তির মর্ম্মন্তুদ শাসনে ও নির্দ্দয় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এরূপ নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল যে, স্বদেশের উদ্ধারের জন্য গৃহীত ব্রত ব্যক্তিগণের মধ্যেও পরামর্শের একতা ও মতের সমতা ছিল না। বহুদিনের দাসত্বের ফলে তাঁহারা পরস্পর বিদ্বেষী ও কার্য্য-কালে সংশয়াকুল হইয়াছিলেন।" এই বিবরণ হইতেই পতিত ইতালীর দুর্দ্দশা অনেকটা বুঝা যায়।

ইতালীর শোচনীয় অবস্থা—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় মনের আনন্দে যথেচ্ছভাবে গরীব জনসাধারণ লুণ্ঠন করিয়া আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। কেহই জন সাধারণের সুখ দুঃখ লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। অসহায় নিরক্ষর জনসাধারণ শক্তিমান রাজশক্তির ও ধনশক্তির নিষ্পেষনে ভারবাহী পশুর ন্যায় দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হইত। কারণ সে সময় 'গণশক্তি' ছিন্নভিন্ন ছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একতার বাঁধন ছিল না। গণশক্তির এই দুরবস্থায় কালমার্কস প্রভৃতি কয়েকজন চিন্তাশীল মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ায় শ্রমজীবিদের মধ্যে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ফরাসীবিপ্লবেই এই নূতন যুগের সূচনা হয়। তদবধি এককালীন বিপ্লব ও সাধারণ তন্ত্রের তরঙ্গাঘাতে সমগ্র ইউরোপ বিক্ষোভিত হইয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালীতেও এই নূতন যুগের নূতন বার্ত্তা পৌঁছিয়াছিল।

যখন মহাবীর নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া দেশের পর দেশ জয়ে সমগ্র পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী হইবার দুরন্ত আশায় নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে সময় নিপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইতালী

ও তাঁহার রাজ্যলোলুপতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ১৮০০ খৃঃ মোরঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অষ্ট্রীয়াকে পরাজিত করিয়া ইতালীকে অষ্ট্রীয়ার কবল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এই নব জীবিত দেশ নিজের আত্মীয় স্বজন ও সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। তাহার ফলে ইতালী বহুধা বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন হয় এবং প্রত্যেক খণ্ডের শাসনকর্ত্তা বা রাজা নিজের ইচ্ছামত একমুখী শাসন পদ্ধতি প্রচলন করেন।

ইতালী ফরাসীর অধীনে অধিক দিন ছিল না। নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রীয়া আসিয়া তাহার পূর্ব্বাধিকার পুনর্স্থাপন করিল। এইরূপে অষ্ট্রীয়ার অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার পুনর্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিরনির্য্যাতিত গণশক্তির নিজের অধিকার কড়ায় ক্রান্তিতে বোঝাপাড়া করাই ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রজা-শক্তির এই জাগরণ রাজতন্ত্রের সহিত অহিনকুল সম্বন্ধ। কাজেই 'গণশক্তি' যাহাতে প্রবল হইতে না পারে তাহার জন্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের রাজ্য সকল পরস্পরের রক্ষার জন্য 'পবিত্র সম্মিলনী' বা holy allience নামক সংঘের সৃষ্টি করেন। প্রজাবিদ্রোহের হাত হইতে রাজাকে রক্ষা করাই এই সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই অষ্ট্রীয়ার অধীনে ইতালীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আইনের অত্যাচার, সামন্ত-তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মঠ স্থাপন, পুরোহিতদের বিচারালয় প্রটেষ্টাণ্ট ও ইহুদীদের নানা বিষয়ে অধিকার লোপ প্রভৃতি অনাচারগুলি আবার পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিল।

অষ্ট্রীয়ার অধীনতাপাশে ও অত্যাচারে সমগ্র ইতালী এই হীন অবস্থায় উপনীত হওয়ায় স্বভাবতঃই ইতালীবাসীর হৃদয় এই বিদেশী অষ্ট্রীয়-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও ইতালীবাসী প্রত্যেকেই সমভাবে অষ্ট্রীয় শাসনকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিত কিন্তু তথাপি স্বদেশ উদ্ধার সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে চারিটি বিভিন্ন মতবাদ ইতালীর ইতিহাসে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মত ও পথ

অষ্ট্রীয় শাসনের উচ্ছেদকল্পে একদল তরুণ ইতালীবাসী গুপ্ত-সমিতি গঠন করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এই সম্প্রদায়ই কার্ব্বোনারো সম্প্রদায় নামে অভিহিত। ইতালীর স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল। অষ্ট্রীয় শাসন হইতে দেশকে মুক্ত করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ভবিষ্যৎ ইতালীর কিরূপ শাসনপদ্ধতি হইবে, কি ভাবে শাসিত হইবে, এবং কেমন করিয়াই বা স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব, এসব বিষয়ে তাঁহাদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দিনের পর দিন এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত তরুণের দল, দলে দলে আসিয়া কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে লাগিল। কাজেই গুপ্তসমিতির কার্য্য অতি অল্প দিন মধ্যে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে আর গুপ্তভাবে থাকা কোন মতেই সম্ভবপর হইল না। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের দূরদৃষ্টি না থাকায় তাঁহারা কিছুতেই নিজেদের শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া পিড্‌মণ্টের রাজা চার্লস আলবার্ট এবং নেপলসের রাজা ফ্রান্সেস কোর সাহায্য গ্রহণ

কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়

করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কার্বোনারো সম্প্রদায়ের এই একমাত্র অবলম্বন ভূপতিদ্বয় যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন তখন এই হতাশা-পীড়িত সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। কিন্তু তখন আর বিদ্রোহ স্থগিত রাখিবার কোন উপায় ছিল না। কাজেই বিদ্রোহ ঘোষণা সম্বন্ধে ও ধ্বংসের কার্য্যে সকলে একমত হইলেও গঠন কার্য্যে বিভিন্ন মতবাদ দেখা দিল। কেহ কেহ সমগ্র ইতালীতে একছত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন; কেহ কেহ স্পেন বা ফরাসীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন; কেহ কেহ ইতালীতে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কয়েকজন ইতালীকে অনেকগুলি সাধারণ-তন্ত্রে বিভক্ত করিবার মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিজেদের এবম্বিধ মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এই সম্প্রদায় একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাহাদের আশা-বৃক্ষে কোন ফলই ফলিল না—না রাজতন্ত্র, না সাধারণতন্ত্র, না বিদেশীয় শক্তির সাহায্য। শুধু অকৃতি বিদ্রোহের বিষ আকণ্ঠ পান করিল।

কার্বোনারো সম্প্রদায় দুই তিন বার এই ভাবে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, প্রথম দিককার বিদ্রোহগুলি উচ্চশ্রেণী ও সৈনিকদের সাহায্য ব্যতীত সফল হইতে পারে না, এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হওয়ায় তাঁহারা নিজেদের শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাদের বিদ্রোহগুলি বিফল হয়। কিন্তু শেষদিকে তাঁহারা নিজেদের এই ভ্রান্তধারণা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন। কিন্তু প্রাদেশিকতার মোহ তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে জাতীয়তা বোধ পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই। কাজেই

নেতারা বৈদেশিক সাহায্যলাভের আশায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সময়মত কার্য্যকারিতার ও ক্ষিপ্রতার অভাবে বিদ্রোহ বিফল হইয়া যায়। তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রাজদণ্ডে দণ্ডিত কার্ব্বোনারো বীরগণ অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতার সহিত প্রাণদণ্ড গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিপদে ধৈর্য্য, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও স্বদেশের কার্য্যে অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ করিয়া হৃদয় তাঁহাদের প্রতি ভক্তি, করুণায় ভরিয়া উঠে। মানুষ যে কেমন করিয়া আদর্শের জন্য অম্লানবদনে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে তাহা এই সকল বীরদের আত্ম-বিসর্জ্জনের ইতিহাস হইতে জানা যায়। কিন্তু তথাপি কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ের কর্ম্মপদ্ধতি কোন দিন সফল হয় নাই। বারংবার তাহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল।

যে সকল স্বদেশপ্রাণ বীরসাধকের প্রাণপাত পরিশ্রমে ইতালীর নব-যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল মনীষী ও কর্ম্মবীর ম্যাটসিনী তাঁহাদের মধ্যে

**নব্য ইতালী সম্প্রদায় ও জোসেফ ম্যাটসিনি**

অন্যতম। ম্যাটসিনি তাঁহার চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া নিজে হাতে একদল তরুণকে গড়িয়া তুলিয়া-ছিলেন। তাহারাই ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসে 'নব্য ইতালী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। ম্যাটসিনীর সহিত এই সম্প্রদায়ের কোন প্রভেদ ছিল না। কাজেই এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে ম্যাটসিনিকে আগে জানা উচিত। সেই জন্যই ম্যাটসিনীর জীবনী সংক্ষেপে দিব। ম্যাটসিনীর জীবনী লিখিলেই এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে পৃথক করিয়া লিখিবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

১৮০৫ খৃঃ ম্যাটসিনীর জন্ম হয়। দেশের অবস্থা তখন অতীব

শোচনীয়। তাঁহার পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এনাটমির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই খুব স্বাধীনচেতা বালক ছিলেন। পোপের নামে তথাকথিত অনাচারগুলি মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রথমে তাঁহাকে পিতার ব্যবসা অবলম্বন করাইবার জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করাই ঠিক ছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি তাঁহার এই পথের বাধা স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি চিকিৎসার ঘরে বীভৎস কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। কজেই তিনি বাধ্য হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য প্রবণ মন কোনদিন তাঁহাকে বিচক্ষণ আইন ব্যবসায়ী হইবার সুযোগ দেয় নাই। তাঁহার ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে। যদি স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির উদ্ধার-রূপ মহত্তর ব্রত তাঁহার সম্মুখীন না হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সারাজীবন নির্ম্মল সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াই অতিবাহিত করিতেন সন্দেহ নাই।

ম্যাটসিনী যে অকাতরে তিল তিল করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাহার গোড়ায় ছিল তাঁহার কিশোর জীবনের একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। তাঁহার বয়স তখন ষোল বৎসর। তিনি তাঁহার মাতার হাত ধরিয়া জেনোয়ার রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় জনৈক ইতালীর বিপ্লবপন্থী আসিয়া বিপ্লবপন্থীদের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ইঁহারা পিড্‌মণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন; কিন্তু পরে অবস্থার গতিকে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া জেনোয়ায় পলায়ন করেন। এই ঘটনা ম্যাটসিনীর কিশোর হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল ভবিষ্যতে তাহারই জন্য তিনি জীবন পণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদবধি শয়নে স্বপনে তিনি এই স্বদেশ মাতৃকার মুক্তির স্বপন দেখিয়াছিলেন।

সাহিত্যের মধ্য দিয়াই প্রথম তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। দেশের সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে নিজের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতেও তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি কার্বোনারো দলে যোগদান করিলেন। কিন্তু অধিক দিন এই দলে থাকিতে পারেন নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কার্বোনারী গুপ্ত সমিতির সভ্য বলিয়া তিনি রাজরোষে পতিত ও বন্দী হইলেন। ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগের পর তিনি কারামুক্ত হ'ন। এই মুক্তির অনতিকাল পরেই তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসন দাণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

এই সময় ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ফ্রান্সের লিঁয় সহরে সমবেত হইয়া ফরাসী সরকারের সহায়তায় ইতালী আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ম্যাটসিনি এই সংবাদ পাইয়া অনতিবিলম্বে আল্পস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া লিঁয় সহরে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিলেন। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যারম্ভের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ফরাসী সরকার বিশ্বাস ঘাতকতা করায় সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল। পুনরায় যখন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে বিদ্রোহ প্রকাশ পায় তখনও তিনি যুদ্ধে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কিন্তু এবারও বিফল মনোরথ হইয়া তিনি লণ্ডনে পলায়ন করেন। লণ্ডনে আসিয়াও প্রচার কার্য্য হইতে বিরত হ'ন নাই। লণ্ডন হইতে ইংরাজ প্রেসের সহায়তা লাভ 'ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র' নীতিকে ইতালীর অনুকূল করা এবং বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য টাকা কড়ির সাহায্য পাইবার আশায় তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রাণ ম্যাটসিনির লোকান্তর ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপব্যাপী যে মহাচাঞ্চল্য উপস্থিত

হইয়াছিল—দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ম্যাটসিনী তাহার প্রভাব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কার্ল মার্কস প্রভৃতি মনীষিগণ নূতন চিন্তার ধারায় একটা নব-যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ম্যাটসিনী তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া চিন্তা ও কর্ম্মের যে অত্যদ্ভুত সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। মধ্যযুগের পর হইতে ধর্ম্ম রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ম্যাটসিনি বরাবর রাজনীতিকে ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রাজতন্ত্রের একজন প্রধান শত্রু ছিলেন। ইতালীতে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ছিল ইতালীতে ঐক্যের সংস্থাপন এবং সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। ইহাই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এই ব্রতকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে আজীবন কতই না কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। অনাহারে অনিদ্রায় ইউরোপের অলি গলিতে ঘুরিয়া, গুপ্ত পুলিশের হাত হইতে অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়া, সারাজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আজ ইতালীতে মিঃ কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর নাম লোকসমাজে যদিও সর্ব্বাধিক পরিচিত, কিন্তু মহাপ্রাণ ম্যাটসিনীর নাম তাঁহার আদর্শ, তাঁহার অদ্ভুত কার্য্য ও অদম্য উৎসাহ মানব হৃদয়ের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া যায়।

ম্যাটসিনীর শিক্ষা

খণ্ড বিদ্রোহের দ্বারাই ম্যাটসিনী তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত ইতালীর স্বাধীনতা আনায়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের নামে সমগ্র ইতালীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন

না। তিনি নিজের আত্ম বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস করিয়া এক উদারতর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, মানবতার উদার ধর্ম্মের দ্বারাই ইতালীতে ঐক্য স্থাপিত হবে এবং ঐক্য স্থাপিত করিয়া খণ্ড বিদ্রোহের দ্বারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। তিনি যে সময় এ সকল মত প্রচার করিতেছিলেন সে সময় খণ্ড বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা আনয়ন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ তখন অষ্ট্রীয়া নূতন বল সঞ্চয় করিয়াছে, ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, জার্ম্মানীতে গণ-শক্তির প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ইতালীর এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি তিনি যথোপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই, তদ্ব্যতীত বিদেশে থাকায় দেশের অভ্যন্তরীন প্রকৃত অবস্থাও তিনি ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পান নাই। তজ্জন্য তিনি পিড্‌মণ্ট এবং ইহার রাজাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই এবং কাভুরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ফলে খণ্ড যুদ্ধের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান দুর্ব্বলতা ছিল, "তিনি কোনও নূতন ভাব গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন। একটি মতের প্রবর্ত্তক যাঁহারা, তাঁহারা স্বভাবতঃই [illegible]; এবং তাহার উপর ম্যাটসিনীর সমস্ত ভাবগুলি পরস্পর এত বেশী দৃঢ় সম্বন্ধ যে একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক করা যায় না। তিনি কাহারও পরামর্শ সহিতে পারিতেন না; যদি কেহ তাঁহার মতে মত না দিত তবে তিনি তাহার কথা বিচার না করিয়া তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া তুলিতেন"; কাজেই তিনি একগুঁয়ে ভাবে অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই বন্দুকের খোঁচায় দেশের স্বাধীনতা আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-চলার-পথ

যতই না কেন ভ্রান্ত হউক ইতালী যে এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সজীব, সতেজ ও নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনিই প্রথম জাতির হৃদয়ে নিজের শক্তিতে, নিজের চেষ্টায়, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস ও আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছিলেন।

ম্যাটসিনী জগৎকে শুধু তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি এবং উচ্চ ভাব-রাশিই দিয়া যান নাই। তিনি এই ভাবগুলিকে মূর্ত্তি দিবার জন্য নিজে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এই 'নব্য ইতালী' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাটসিনী এই কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া নূতন ভিত্তির উপর ইতালীর যুবক সম্প্রদায় লইয়া এই 'নব্য ইতালী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের বাণী হইল—সাম্য, মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা। এবং মূলমন্ত্র হইল—ভগবান ও জন সাধারণ। শ্বেত, লোহিত, হরিত—এই তিন রঙ। তাহাদের জাতীয় পতাকারূপে গণ্য হইল। ইহারা অনর্থক নরহত্যার বিরোধী ছিলেন। শুধু শিক্ষা বিস্তার ও রাজদ্রোহ প্রচারের দ্বারা দেশে বিদ্রোহ আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কার্ব্বোনারো সম্প্রদায় পরিচয় চিহ্নরূপে তরবারি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এই নব্য ইতালী সম্প্রদায় তৎপরিবর্ত্তে পুস্তক এবং শোকচিহ্ন ব্যবহার করিলেন। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের কার্য্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল। ঐই বহু বিস্তৃত নব্য ইতালী সম্প্রদায় ম্যাটসিনীর কর্ম্মজীবনের কীর্ত্তি স্বরূপ। তিনি তাঁহার স্বহস্তে গঠিত এই নব্য ইতালী সম্প্রদায়ের সহায়ে দেশের মধ্যে ঐক্যের সংস্থাপন ও সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার

ম্যাটসিনী ও নব্য-ইতালী সম্প্রদায়

জন্য আমরণ প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে মহাপ্রাণ ম্যাটসিনী জীবনে ভাব ও কর্ম্মের সমন্বয় আনিয়াছিলেন।

ম্যাটসিনি ও কাভুর দুইটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধি। ম্যাটসিনী ছিলেন সাধারণতন্ত্র বাদী ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষপাতী। কূট রাজনীতির ধার ধারিতেন না। অপরদিকে কাভুর ছিলেন রাজতন্ত্রবাদী, কূট রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কার প্রয়াসী। কাজেই এইরূপ দুইজন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তি কখনই একমত হইয়া কাজ করিতে পারে না। ইহার ফলে আজীবন উভয়েই উভয়কে হিংসা করিতেন।

মডারেট দল ও কাভুর

কাভুর পিড্‌মন্টীয় নোবল ছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একান্ন বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি বহুধা বিভক্ত ইতালাতে জাতীয়তা বোধ উদ্রেক করিয়া ঐক্য সংস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কার্ব্বোনারো ও নব্য ইতালী সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্রোহ করিয়া দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করা বিশ্বাস করিতেন না। কারণ তিনি মনে করিতেন যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে এই সকল খণ্ড বিদ্রোহের কোন মূল্যই নাই। নিতান্তই তুচ্ছ। অথচ ইহাও জানিতেন যে অষ্ট্রীয়াকে দূর করিতে না পারিলে ইতালীর মুক্তি নাই। কাজেই অষ্ট্রীয়াকে ইতালী হইতে বহিষ্কৃত করিবার মানসে তিনি বিদেশী শক্তির শরণাপন্ন হইয়া কূট রাজনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং দেশের মধ্যে ম্যাটসিনী প্রভৃতির ন্যায় খণ্ড বিদ্রোহের দ্বারা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা না করিয়া তৎকালীন প্রবর্ত্তিত রাজতন্ত্রের শাসন পদ্ধতির সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রাজতন্ত্রের একমুখী ক্ষমতা খর্ব্ব

করিয়া বৃটিশের ন্যায় সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited monarchy) প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—A free church in a free state.

কাভুর রাজতন্ত্রের উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে অনেক কটুক্তি করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি যে স্বদেশকে প্রকৃতই মনে প্রাণে ভালবাসিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে কাভুরই ইতালীর স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন। আজ তাঁহার নাম ইতালীতে দেবদেবীর ন্যায় ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকে। তিনিই ঠিক সময়ে দেশের প্রকৃত দুর্ব্বলতার অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন।

পোপের দল

এই দল পোপকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া তাঁহার অধীনে সমগ্র ইতালীকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং পোপের পূত চরণ স্পর্শে পবিত্র হইয়া পোপের আদেশানুযায়ী স্বদেশের স্বাধীনতা আনিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন 'ভিনসিনজো জিয়োবার্টি', তবে ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এই দলের প্রভাব বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ষোড়শ গ্রেগাড়ীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জিয়োবার্টি একখানি পুস্তক লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে "এমন একজন পোপ আসিতেছেন, যাহার ছায়াতলে রাজা ও প্রজা সমান ভাবে থাকিতে পারিবে।" ইহার অল্পদিন পর গ্রেগারীর মৃত্যুতে 'পায়সে' নবম পোপ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 'পায়স' পোপ হইয়াই সমস্ত রাজবন্দী ও নির্ব্বাসিতদের মুক্তি দিলেন। ইহাতে দেশের মধ্যে খুব হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ধর্ম্মভীরু ও অশিক্ষিতের দল পায়াসকেই জিয়োবার্টের কথিত পোপ বলিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতে

লাগিল। সমগ্র ইতালীতে বেশ উত্তেজনা দেখা দিল কিন্তু সে সময় দেশে যেসুইট সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় জনসাধারণ অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। পোপ গতিক দেখিয়া গোপনে অষ্টীয়ার সঙ্গে সন্ধি করিলেন এবং ক্রমাগত জনসাধারণকে এই যুদ্ধে বাধা দিতে লাগিলেন। ফলে যুদ্ধের প্রাক্কালে জনসাধারণ পোপের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল। এই সুযোগে উদারনীতিকগণ খুব ক্ষমতা বিস্তার করিয়া লইলেন। কাজেই পোপ গেটায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ইতালীতে রোমের একাধিপত্যের আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

দেশের ঘোর দুর্দ্দশার দিনে নানা মুনির নানা মত হইতে দেখা যায়। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস প্রত্যেক হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। এই সময় নিঃস্বার্থ কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। আমরা বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সঙ্গে যদি নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর গ্যারিবল্ডীর জীবন চরিত আলোচনা না করি, ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাস অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

গ্যারিবল্ডী

গ্যারিবল্ডী ম্যাটসনীর সম সাময়িক লোক ছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডীর জন্ম হয় এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় কর্ম্মবীর গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হয়। গ্যারিবল্ডীর পিতা সমুদ্র পথে বাণিজ্যপোত পরিচালনা করিতেন। গ্যারিবল্ডীও বাল্যকাল হইতেই পিতার নাবিক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডীর জীবন চরিত লেখক ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর তুলনা করিতে গিয়া প্রকৃতই বলিয়াছেন "এক জনের আদর্শ নারায়ণ, অন্য জনের আদর্শ

নর-নারায়ণ। একজন শ্রীকৃষ্ণ, অন্যজন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্র সমরের প্রকৃত নায়ক, ম্যাটসিনীও সেই রূপ ইতালীর স্বাধীনতা সমরের প্রকৃত নেতা। এই জ্ঞানময় ও কর্ম্ম ময় জীবনের ঐকতানিক সাধনা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ফ্রান্সের বিপ্লবে রুঁসো ও ভল্টেয়ার, আমেরিকার বিপ্লবে আডামস্ স্মিথ ও ফ্রাঙ্কলিন এবং ইতালীর বিপ্লবে ম্যাটসিনী—নারায়ণের অবতার। আর ফরাসী বিপ্লবে নেপোলিয়ান, আমেরিকা বিপ্লবে ওয়াসিংটন এবং ইতালী বিপ্লবে গ্যারিবল্ডী—নরনারায়ণের অবতার।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্যারিবল্ডীর প্রথম জীবন নাবিকের কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। নাবিকের কার্য্যে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী তাঁহার নাবিক জীবনেই স্বদেশের মুক্তি-মন্ত্র মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাটসিনীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় এবং ম্যাটসিনীর মুখে দেশের দুরাবস্থা ও রাজার অকথিত অত্যাচারের কথা শুনিয়া স্বদেশ উদ্ধারকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। গ্যারিবল্ডী এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া ম্যাটসিনীর সহিত যোগদান করায় সোনায় সোহাগার সংযোগ হইল।

ম্যাটসিনীর সহিত সমবেত হইয়া গ্যারিবল্ডী ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পিড্‌মণ্ট আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডী উভয়কেই প্রাণ লইয়া পলাইতে হইয়াছিল। গ্যারিবল্ডী বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন। আমেরিকাতেও সে সময় সাধারণ-তন্ত্রের সংগ্রাম চলিতেছিল। গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত

হইয়া 'উরুগয়ে-সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষ লইয়া দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালনা করেন। সাধারণতন্ত্রেরই জয় হইল। গ্যারিবল্ডী 'উরুগয়ে'র সাধারণ তন্ত্রে সেনাপতি পদে বরিত হইলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস আলবার্টের মিথ্যা ছলনায় ইতালীর জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং গ্যারিবল্ডীকে স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করে। গ্যারিবল্ডীও সদল বলে আমেরিকা হইতে ইতালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। প্রত্যেক যুদ্ধে গ্যারিবল্ডী অসীম সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ এই সময় তিনি যুদ্ধে আহত হইলেন এবং নিজের দলের নেতাদের নানা মতভেদ দেখা দিল। ফলে, গ্যারিবল্ডীকে বাধ্য হইয়া রণে ভঙ্গ দিতে হইল। তিনি পুনরার আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন এবং অতি দীন ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে, পেরু দেশীয় সৈন্য দলের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইতালীর 'পালেরমো' নামকস্থানে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। স্বাধীনতার সজীব মূর্ত্তি গ্যারিবল্ডী পুনরায় স্বদেশে আসিয়া একদল ভলেণ্টিয়ার সৈন্য গঠন করিয়া অমিতবিক্রমে নেপলস জয় করিলেন। নেপলসের রাজা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। গ্যারিবল্ডীর এই জয়ের পর জয়ের খ্যাতি দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া গ্যারিবল্ডীর সহিত যোগদান করিলেন। নূতন বলে বলীয়ান হইয়া গ্যারিবল্ডী ক্রমাগত দশটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ইতালীতে স্বাধীনতা স্থাপন করেন। এই সময় ম্যাটসিনীর সহিত গ্যারিবল্ডীর মত বিরোধ ঘটিল। ম্যাটসিনী তাঁহার চিরাকাঙ্খিত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে

চাহিলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী এই সময় কাভুরের সহিত যোগদান করিয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় গ্যারিবল্ডীর সামরিক শক্তি এবং জনসাধারণের বর্দ্ধমান শ্রদ্ধা দিন দিন এত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে সমগ্র ইতালীর একছত্র অধীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী এই অবস্থায় নিঃস্বার্থপরতার যে মহান আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহা এই দ্বেষ-হিংসা-স্বার্থ-প্রপীড়িত কলিতে সত্যই অতুলনীয়। বাহুবলে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া প্রাণপাত চেষ্টায় রাজ্যের সমস্ত কণ্টক দূর করিয়া, দেশের প্রকৃত রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে স্বাধীন ইতালির রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

ইতালীর লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করাই মহাবীর গ্যারিবল্ডীর চরম উদ্দেশ্য ছিল। দেশের এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ভোগকে কেমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে হয় তাহা গ্যারিবল্ডীর জীবন হইতে প্রত্যক্ষ জানা যায়। দীপের অভাবে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া অন্ধকার গৃহে বসিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। কথিত আছে গ্যারিবল্ডী একদিন ঐভাবে অন্ধকার গৃহে স্ত্রী পুত্র লইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজ সেনাপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় অন্ধকারে বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও লজ্জিত হইয়া মহাবীরের সাংসারিক অভাব দূর করিবার জন্য রাজকোষ হইতে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু সে অর্থও গ্যারিবল্ডী গরীবের দুঃখ নিবারণের জন্যই ব্যয় করিয়াছিলেন। দুঃখতেই যাহার সুখ তাহাকে সাহায্য করিয়া দুঃখ নিবারণ করা যায় না। অধিক কি যেদিন তিনি সমগ্র ইতালী রাজ্য

ইম্যানুয়েলকে দান করিয়া ক্যাপরো দ্বীপে প্রস্থান করেন সেদিন ইচ্ছা করিলে তিনি প্রচুর ধনরত্ন লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিন তিনি রিক্তহস্তে ক্যাপরো দ্বীপে প্রস্থান করিলেন। রাজা তাঁহাকে অর্থ লইতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার বাহুযুগল দেখাইয়া বলেন—ইহাতে এখনও শক্তি আছে, চাষ করিয়া খাইব। স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি গ্যারিবল্ডীর মুখেই একথা সাজে।

ইতালীর রাষ্ট্র-বিপ্লবে কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ই প্রথম রক্ত-যুগের অবতারণা করেন, পরে ম্যাটসিনী প্রতিষ্ঠিত নব্য ইতালী সম্প্রদায় ইতালীতে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই কার্ব্বোনারো ও নব্য ইতালী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় অনেক ত্রুটি ও দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া ক্রমাগত ১৮২১, ১৮৩১ এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ হইয়া গেল।

ইতালীর স্বাধীনতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ইহার মধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল তবে ইতালীর ইতিহাসে এই কয়টি বিদ্রোহই প্রসিদ্ধ এবং তন্মধ্যে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতি সামান্যের জন্যই ইতালীবাসীর এই বিদ্রোহ অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। যাহাই হউক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রশমিত হইল বটে কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ গুমট ভাব ঘুচিল না এবং পশুশক্তির প্রয়োগে কোনদিন কোথাও বিদ্রোহের মূল নষ্ট করিতে পারে নাই। অষ্ট্রীয়াও পশুশক্তির প্রভাবে ইতালীবাসীর হৃদয়ের নব জাগ্রত বিদ্রোহশক্তি নষ্ট করিতে পারিল না; উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় ধূমায়িত হইতে লাগিল। এই সময়েই রাজনীতি-শ্রেষ্ঠ কাভুরের আবির্ভাব।

অষ্ট্রীয়ার রাজা তাঁহাকে পিড্‌মণ্টে ইচ্ছানুরূপ শাসনপদ্ধতি প্রচলিত

করিতে আদেশ করেন এবং তাহাতে তিনি কোনরূপ বাধা দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইম্যান্থয়েল অষ্ট্রীয়রাজের এই অযাচিত দানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সমগ্র ইতালীর স্বাধীনতার্জ্জনে তৎপর হইয়াছিলেন এবং বিচক্ষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ কাভুর এই সময়ে তাঁহার প্রধান অমাত্যের পদ অলঙ্কৃত করিয়া ইম্যান্থয়েলের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের অকৃতি বিদ্রোহের পর কাভুর স্থির বুঝিয়াছিলেন যে ম্যাটসিনি প্রচলিত খণ্ড-বিদ্রোহের দ্বারা ইতালীর স্বাধীনতা আনয়ন করা সম্ভবপর নয়। অষ্ট্রীয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে হইলে বাহিরের শক্তির সহায়তা একান্ত আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের শক্তিনিচয়ের প্যারিস কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ইতালীর স্বাধীনতাযুদ্ধে ইউরোপের শক্তিবর্গকে সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তীকালে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হ'ন।

কাভুর এই ভাবে ফরাসীরাজের শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া নিজ-রাজ্যের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অষ্ট্রীয়রাজ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কাভুর অষ্ট্রীয়রাজের এ আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই অষ্ট্রীয়রাজ বাধ্য হইয়া ইতালী আক্রমণ করিলেন। এই সময় গ্যারিবল্ডী তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী লইয়া অষ্ট্রীয়া সৈন্যবাহিনীকে বারম্বার অতর্কিত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ওদিকে ইতালী ও ফরাসীর সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর নিকট অষ্ট্রীয়ার সৈন্যবাহিনী উপর্য্যুপরি দুইবার পরাস্ত হইল।

ইতালীবাসী যখন এই জয়ের পর জয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান তখন হঠাৎ ফরাসীসম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়সম্রাট জোসেফ ফ্রাঙ্কসিসের সহিত এক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইম্যানুয়েল ইতালীর লম্বার্ডি প্রদেশ পাইবে এবং ভেনিস অষ্ট্রীয়ার করতলগত হইবে ও ইতালীর অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অষ্ট্রীয়ার তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

ফরাসী সম্রাটের অকস্মাৎ ইতালীর সহিত মনোভঙ্গ করিয়া শত্রুপক্ষ অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করার অনেকগুলি কারণ ছিল। (১) তিনি যত সহজে অষ্ট্রীয়াকে পরাজিত করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে, ইহার জন্য বহু লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। (২) তাঁহার ভয় হইয়াছিল প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার হইয়া যোগ দিলে ফরাসীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা (৩) ইতালীর সমস্ত রাজ্যগুলি যদি পিড্‌মণ্টের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে ইতালী প্রবল হইয়া পড়িবে।" একতাবদ্ধ স্বাধীন ইতালি ফরাসী সম্রাটের বাঞ্ছনীয় ছিল না। তিনি কাভুরকে সাহায্য করিয়া শুধু পিড্‌মণ্ট প্রদেশকে শক্তিমন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ পিডমণ্ট শক্তিমন্ত হইলে ফরাসী সম্রাটের অষ্ট্রীয়াকে ভয় করিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। ইতালী এই সুবর্ণ সুযোগে একতাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। কাজেই যাহাতে স্বাধীন ইতালী নব বলে বলীয়ান হইয়া ফরাসীর রাজ্যলিপ্সা প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তজ্জন্য অসময়ে তাহাদিগের সহিত সর্ত্তভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিল। যাহাই হউক ইতালী বাসী ফরাসীর এই ব্যবহারে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কাভুর ভগ্নহৃদয়ে প্রধান অমাত্যের পদ ত্যাগ করিলেন।

অবশেষে ইম্যানুয়েলকে বাধ্য হইয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধির ফলে ভেনিস অষ্ট্রীয়ার এবং রোম ফরাসীর হস্তগত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে টস্‌ক্যানি, পার্শ্মা, মডেনা এবং রোমাগেনা প্রভৃতি প্রদেশগুলি সার্দ্দিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া নৃপতি ইম্যানুয়েলের রাজছত্রতলে আসিয়া যোগ দিল। এইভাবে উত্তর ইতালী সংঘবদ্ধ হওয়ায়ও সমগ্র ইতালীর স্বাধীনতার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইল শুধু বাকী থাকিল ভেনিস ও রোম। এই ঘটনায় ভগ্নহৃদয় কাভুরের মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি আসিয়া পুনরায় ইম্যানুয়েলের সহি যোগ দিয়া নূতন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

কাভুর এবং ইম্যানুয়েল পরামর্শ করিয়া প্রথমেই মহাবীর গ্যারিবল্ডীকে সসৈন্যে সিসিল দ্বীপ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। গ্যারিবল্ডী এই রাজাজ্ঞা পাইয়া অবিলম্বে সসৈন্যে সিসিল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া ঐ দ্বীপ অধিকারপূর্ব্বক রাজা ইম্যানুয়েলের রাজ্যান্তর্ভুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আম্ব্রো ও মার্কে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় ইম্যানুয়েল তৎপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া প্রদেশদ্বয় স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিলেন। এইভাবে ক্রমাগত সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া আক্রমণপূর্ব্বক ইম্যানুয়েল প্রায় সমগ্র ইতালীতে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। কেবলমাত্র ভেনিস ও রোম হইতে তখনও অষ্ট্রীয়া ও ফরাসীর অধিকার দূরীভূত হইল না। এই সময় এই দুই প্রদেশ অধিকারের জন্য অষ্ট্রীয়া ও ফরাসীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা অযুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া কাভুর কিছুদিনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সন্ধানের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ ( ১৮৬১ খ্রীঃ ) এই সময় কাভূরের মৃত্যু ঘটে। রাজা ইম্যানুয়েল এরূপ সুদক্ষ এবং সর্ব্বকার্য্যে দক্ষিণ হস্তবৎ

মন্ত্রীকে হারাইয়াও বিচলিত না হইয়া অতি সন্তর্পণে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সেই চিরঈপ্সিত সুযোগ মিলিল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রুশিয়ায় সহিত অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধ বাধিল। ইম্যানুয়েল প্রুশিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া অষ্ট্রীয়ার বলক্ষয় করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে যদিও ইতালীর পরাজয় ঘটিল কিন্তু প্রুশিয়া অষ্ট্রীয়াকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করায় যুদ্ধাবসানে প্রুশিয়ার চাপে ইতালীকে ভেনিস্ প্রদেশ ত্যাগ করিতে হইল। ঠিক এই ভাবে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রুশিয়ার সহিত ফরাসীর সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সুযোগে রোম প্রদেশও ফরাসীর হস্তচ্যুত হইয়া ইম্যানুয়েলের অধিকৃত হইল।

এক কথায় সমগ্র ইতালীতে স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

আজ আবার ভীম দর্পে ফ্যাসিজিম্ আন্দোলন চলিতেছে। সুবিধা হইলে ইতালীর এই নবীন আন্দোলনের ইতিহাস ও অদূর ভবিষ্যতে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

বন্দেমাতরম্